KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হেস্টিংস স্ট্রিট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : ৪/১ ৪/২ ৪/৩ ৪/৪-৫ ৪/৬	Year of Publication : শ্রাবণ ১৩২৮ ভাদ্র ১৩২৮ আশ্বিন ১৩২৮ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২৮ পৌষ ১৩২৮ Condition : Brittle ✓ / Good ✓
Editor : প্রমথ চৌধুরী, সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

*লেখকের প্রার্থনা

—:*:—

(১)

চুয়ান্ন মাস আগে যে কলম আমার হাতছাড়া হয়েছে, সেই কলম আবার ধরবার মুহূর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে, হে মানবের আত্মা, তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। যে ভীষণ প্রলয়কাণ্ড পার হয়ে আমরা এসেছি, তার মধ্যে তুমি সর্ব্বদাই নিজের পথ ও দিক নির্ণয়, নিজের স্বাধীনতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার চেষ্টায় ফিরেছ, এবং তা পাবার আশা কখনও ত্যাগ করনি ;

হে মানবের বেদনা, তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। নীরব তুমি, অসীম তুমি, কখনো তুমি পরীক্ষাদানে কুণ্ঠিত হওনি, সকলপ্রকার শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা তুমি বুক পেতে নিয়েছ,—গোলাবর্ষণ, বারুদ-উৎক্ষেপ, বিষবাষ্প, অগ্নিবাণ, দুষ্টক্ষত, অঙ্গচ্ছেদ, ক্ষুধা, শৈত্য, ভয়, সংশয়, বিচ্ছেদ ও হতাশা ;

হে মানবের করুণা, তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। পৃথিবীময় তুমি বিনীত ও একনিষ্ঠ সেবক জাগিয়ে তুলেছ, এবং সর্ব্বত্র যেখানে ব্যথা সেখানে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছ। সংক্রামক রোগ কর্দ্দম ও শীত, বস্ত্রাভাব ও গৃহদাহ, হিংসা নিরাশা ও নিঃসঙ্গতা,—এরাই ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ;

*Jean Richard Bloch-এর Carnaval est mort নামক ফরাসী গ্রন্থ হইতে। এই ফরাসী লেখক চুয়ান্ন মাস ইয়োরোপীয় মহাসমরে যুদ্ধ করে' করে' কাটিয়েছেন। ফিরে এসে তিনি উপরিউক্ত গ্রন্থ লিখেছেন।

হে মানবের বন্ধুতা,—পুরুষে পুরুষে বন্ধুতা ও মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুতা,—তোমার কাছে আমি মাথা নত করি। মনুষ্যজাতির উচ্ছেদসাধনের এই যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, সে সময় তুমি প্রকৃতই জাতি-সংযোজনের কাজ করেছ। তুমি আমাদের সকলকে সহ্য করবার ও অগ্রসর হবার শক্তি দিয়েছ, আনন্দ ও আশাপূর্ণ মনে থাকবার বল দিয়েছ;

মানবের আত্মা, মানবের বেদনা, করুণা ও বন্ধুতা,—তোমাদের এই চতুষ্টয়ের কাছে আমি মাথা নত করি, কারণ তোমরা আমার মনুষ্যজন্মগ্রহণের লজ্জানিবারণ করেছ। তোমরা আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছ যে, নরজন্ম বা নারীজন্ম লাভ করায় যেমন বিপদভয় আছে, তেমনি গৌরবও আছে; নর এবং নারীর প্রতি তোমরা আমার ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্দ্ধন করেছ।

(২)

আজ আমি ফিরে এসে এক নতুন পৃথিবী দেখছি। এ পৃথিবী যুদ্ধের আগেকার মতই আছে, সে কথা বল্লে শুনব না; আমাদের ছেলেরাই ঠিকমত বলতে পারবে যে কি-পরিমাণে এখনই আমরা এক আলাদা পৃথিবীতে বাস করছি, এবং কি-পরিমাণে আরও বেশি বদল হবার উপক্রম দেখা যাচ্ছে,—শুভস্য শীঘ্রং।

যে পুরাতন পৃথিবীতে আমরা মানুষ হয়েছি ও যেটি আমাদের সামনে আদর্শরূপে ধরা হয়েছে,, সেই পৃথিবী থেকে হিংসা, অবজ্ঞা, শক্তিমত্তা, আত্মাভিমান ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি অবতারবিশেষ লোপ পেয়েছে।

আবার কলম ধরবার মুহূর্ত্তে আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবী আমাদের সকলেরই ভার অতি সহজে বহন করতে পারে, এ

পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রত্যেক মানুষে যেন আশ্রয়নিমিত্ত একটি সুভব্য চাল, এবং ছেলেদের স্বাস্থ্যপূর্ণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ করবার নিমিত্ত একটি সুযোগ্য ভূমিখণ্ড লাভ করে;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবী আমাদের সকলকেই অতি সহজে পোষণ করতে পারে, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রত্যেক মানুষের পক্ষে শরীরের খাদ্য এবং মনের খাদ্য যেন সমান সুপ্রাপ্য হয়;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবীতে সকলকারই পক্ষে পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্র, সাগর এবং খনি রয়েছে, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে আর কখনো যেন বলবীর্য্য, গৌরব, সাম্রাজ্য, আত্মাভিমান, স্বার্থ বা জাতীয় প্রতিযোগিতার দোহাই দিয়ে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট না করা হয়;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবীর বাতাসে ও ধান্যে কারোর চেয়ে কারো অধিকার কমবেশি নয়, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোক, অথবা কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের দল যেন তার ঐশ্বর্য্য, বংশমর্য্যাদা বা দারিদ্র্যের নামে বাদবাকি সকলের উপর এমন কোন অন্যায় শাসনতন্ত্র স্থাপন করতে না পারে, যার ফলে দুর্দ্দান্ত, ক্রুর এবং শঠ লোকের অভ্যুদয় অনিবার্য্য;

আমি এই প্রার্থনা করছি যে, এই যে পৃথিবী, যেখানে "কিছু না" থেকে 'কিছু' উৎপন্ন হয় না, এ পৃথিবীপৃষ্ঠে যেন শ্রমকে সকলের পক্ষেই সমান কর্ত্তব্যের ও সমান সম্মানের পদবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়,—অথচ এমন ধীরভাবে যা'তে প্রত্যেকের স্বাভাবিক প্রবণতার ব্যাঘাত না ঘটে।

(৩)

আবার কলম ধরবার মুহূর্ত্তে, যারা এই যুদ্ধে হত হয়েছে, সেই

পরিচিত-অপরিচিত বয়স্যদের আমার অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, তারাই আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে;

যারা চিন্তাক্লিষ্ট মনে অথচ হাস্যমুখে নিয়তির সম্মুখীন হয়েছে, আমার অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা তাদের জানাই, কারণ তারাই আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে;

এই যুদ্ধব্যাপারের সময় যাদের মনে নিঃস্বার্থ কোন ভাব স্থান পেয়েছে, আমার অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা তাদের জানাই, কারণ তারাই আমার মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে।

এই মুহূর্ত্তে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, মানুষের দুঃখকষ্ট যেখানে দেখ্‌ব সেইখানেই তার খোঁজ করা, প্রতিবাদ করা এবং দূর করার কাজে আরো বেশি করে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব;

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, মানুষের মর্য্যাদার যে সকল উপাদান—আত্মশক্তি, বেদনা, করুণা, বন্ধুতা, সহিষ্ণুতা, বিদ্রোহভাব, কাজ, স্বাধীনতা, আনন্দ ও নিঃস্বার্থপরতা,—আমার লিপিচাতুর্য্যকে তারই সাহায্যে ব্রতী করব;

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে কখনো ভুলব না।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

ভারতের শিক্ষার আদর্শ*

—:*:—

৪র্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সজীব পদার্থ মাত্রেই শিক্ষার মত নিজেকে অতিক্রম করে অনেক দূর ব্যপ্ত হয়ে থাকে। অতএব তার একটী ক্ষুদ্র এবং একটী বৃহৎ সত্তা আছে। এর এই ক্ষুদ্র সত্তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়—একে আমরা স্পর্শ কর্‌তে—ধারণ কর্‌তে এবং আয়ত্ত করতে পারি। এর অপর সত্তাটী অনির্দ্দিষ্ট। এর কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই—এ দেশে এবং কালে অসীম হয়েই বিস্তৃত হয়ে থাকে। যখন আমরা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেখি তখন তাদের এই ক্ষুদ্রতর সত্তা অর্থাৎ তাদের অট্টালিকাশ্রেণী- তাদের আসবার পত্র ও তাদের আইন কানুনই প্রধানতঃ আমাদের চোখে পড়ে। এর বৃহত্তর সত্তা আমরা দেখতে পাই না। নারিকেলের শাঁস যেমন সমগ্র নারিকেলকেই আশ্রয় করে থাকে তেমনি ইউরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলিও তাদের সমগ্র দেশকে আশ্রয় করে আছে। কি সমাজে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি সাহিত্যে দেশের সমস্ত চেষ্টার মধ্যেই তারা স্থান পায়। যে সব ভাব তাদের পাঠ্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় সেই সব ভাব যে সব মানুষের চিন্তা—চেষ্টা ও সমালোচনা থেকে উদ্ভূত সেই সব মানুষ সজীব ভাবেই তাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে।

*রবীন্দ্রনাথের The centre of Indian culture নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

সজীব চিত্তের সাধারণ যোগসূত্রের দ্বারা তাদের শিক্ষক এবং ছাত্র-মণ্ডলী একই শিক্ষার সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে থাকে, তাদের এই যোগ সজীব ও জ্যোতির্ম্ময়। মোটের উপর তাদের শিক্ষার একটী চিরস্থায়ী আধার আছে—সেটী তাদের চিত্ত; তার একটী উৎস আছে—সেটী তাদের অনুশীলন এবং সেই শিক্ষাকে প্রয়োগ করবার একটী ক্ষেত্র আছে—সেটী তাদের সামাজিক জীবন। তাদের চিত্ত অনুশীলন ও জীবন যাত্রার মধ্যে এই যে একটী সজীব যোগ আছে এরই দ্বারায় তারা ভিন্ন ভিন্ন কাল হতে সত্য আহরণ করে—তাকে অনুশীলনের দ্বারা জীর্ণ করে তাই দিয়ে তাদের সভ্যতাকে নব নব সম্পদে মণ্ডিত করতে পেরেছে।

পক্ষান্তরে যারা আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মত বাস্তবিক মানসিক উন্নতির জন্য নয়—কেবল বাহিরের সুবিধা লাভের তরে গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাদের মন ও বুদ্ধি স্বভাবতঃই শীর্ণ হয়ে পড়ে। যে সব শিশু কৃত্রিম দুধ খায় তাদের স্বাস্থ্যের যে দশা হয় এইরূপ লোকের মন ও বুদ্ধিরও সেই দশা হয়ে পড়ে। তাদের বুদ্ধিতে সাহস থাকে না, তার কারণ তারা যে সব ভাব শিক্ষা করতে বাধ্য হয় সেই সব ভাব যে বেষ্টন এবং যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত তারা তার পরিচয় লাভ করবার আদৌ অবকাশ পায় না। এই রূপে সেই সব ভাবের ইতিহাস তাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায় এবং তাদের সম্বন্ধে তাদের এই পরিপ্রেক্ষিত ধারণার অভাব বশতঃ তারা তাদের তাৎপর্য্য যথাযথ গ্রহণ করতে পারে না। তারা শাদার উপর কাল রঙের মুদ্রিত অক্ষরের মায়ায় একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে; সেই অক্ষরের আদি যে মানুষ তাকে বিস্মৃত

হয়। তারা যে এইরূপে শুধু বিদেশী সভ্যতার অনুকরণ করে তাহা নহে—তাদের বিচারের আদর্শকেও তারা বিদেশীর কাছে ধার করতে থাকে। অতএব শুধু যে টাকাটা তাদের নিজের নয়—তা নয়—এই টাকা তারা যেখানে রাখে সে পকেট্‌টা পর্য্যন্ত অপরের। আমাদের এই শিক্ষার বাহনটী আমাদের তার মধ্যে চড়িয়ে বহণ করে না—এ তার পশ্চাতে আমাদের বেঁধে টেনে হিঁচড়ে চলে। এই দৃশ্য যেমনি করুণ তেমনি হাস্যকর। যে ইউরোপীয় সভ্যতার সত্য ও শক্তি তার গতিশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই আমাদের কাছে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের মত আড়ষ্ট হয়ে উপস্থিত হয়। প্রাচীন শাস্ত্রকে আপ্ত বাক্য বলে আমাদের মন যেমন তার সমালোচনা করতে সাহসী হয় না—ইউরোপীয় সভ্যতার সম্বন্ধে আমাদের আচরণও সেইরূপ দাঁড়িয়েছে।

এই করে আমরা সজীব সত্যের গতিশীলতাকে হারিয়েছি। ইংরাজের চিত্ত আদি ভিক্টোরিয়া যুগ থেকে মধ্য ভিক্টোরিয়া যুগে এবং মধ্য ভিক্টোরিয়া যুগ থেকে ভিক্টোরিয়ার পরবর্ত্তী কালে কত ভাব—কত আদর্শ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে তা' দেখ্‌লে বিস্মিত হতে হয়।

আর আমরা? আমরা যদিও সেই ইংরাজের নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করছি—তথাপি আমরা সেই সব ভাব ও আদর্শের একটা না একটাকে ধরে তাদেরই সনাতন বলে ধরে বসে আছি। আমরা আমাদের শিক্ষকদের চলমান চিত্তের তালে তালে চালাতে পারছি না—আমরা কেবল এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে লাফিয়ে চল্‌তে চল্‌তে জীবনের সামঞ্জস্য থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছি। আমাদের মধ্যে

কেহবা মিল—বেন্থাম্, কেহবা চেম্বারটন্—বার্ণার্ড সর মতের মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে চলেছি। তাদের পরস্পরের মধ্যে যে একটা ঘাত প্রতিঘাতের অনিবার্য্য যোগ আছে তা'আমরা দেখ্‌তে পাই না। আমরা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী বলে যখন গর্ব্ব করি তখন একথা বিস্মৃত হই যে বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে উত্তীর্ণ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

৫ম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সজীব সূত্রের মধ্য দিয়েই জীবনের সহিত জীবনের সম্মিলন ঘটে; সুতরাং চিত্তের প্রাণ যে শিক্ষা তা কেবল জীবন্ত মানুষের মধ্য দিয়েই জীবন্ত মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। পুঁথিগত বিদ্যা এবং শাস্ত্রের সূত্র কেবল আমাদের বিদ্যাভিমানকে বাড়িয়ে তোলে মাত্র। এই সব শিক্ষা স্থাবর বলে পরিমানে সহজেই বেড়ে যায়। এইরূপে অর্জ্জিত শিক্ষার সঞ্চয়কে সতর্কতার সহিত রক্ষা করায় আমরা এক প্রকারের ভোগসুখ অনুভব করি। কিন্তু প্রকৃত যা' শিক্ষা তা অনুশীলনের দ্বারায় কেবলি চল্‌তে থাকে, বাড়্‌তে থেকে এবং দিন দিন অধিকতর প্রাণময় হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে শুধু তাদের সমাজে শিক্ষিত মানুষের বেষ্টনের মধ্যে বাস করে তা নয় তারা তাদের

শিক্ষকের কাছ থেকে অব্যবহিত ভাবেই তাদের শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা সিদা সূর্য্যের নিকট হতেই আলোক পায়। শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে যে একটী মানবীয় সম্বন্ধ আছে তাহাই এ স্থলে সূর্য্যের কাজ করে। আমাদের এই সূর্য্যের স্থলে আছে কঠিন চকমকি পাথর অনেক পরিশ্রমের পর অনেক ঠোকাঠুকি করে আমরা তা থেকে অসম্বদ্ধ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করি মাত্র। তাতে যতটা আলোক উৎপন্ন হয় তার চেয়ে শব্দটাই বেশী হয়ে পড়ে। বস্তু বিবর্জ্জিত পুঁথিগত শিক্ষাই এই চক্‌মকি। এ এক কঠিন প্রথার মধ্যেই আবদ্ধ।

আমাদেয় দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আসবাবই আছে, নাই কেবল শিক্ষা দিবার এই মানুষটী। তার পরিবর্ত্তে আমাদের এখানে আছে পুঁথিগত শিক্ষা সরবরাহ কর্‌বার একপ্রকারের যোগাড়ে। মনে হয় পুস্তকালয়ের অধিদেবতাটী যেন মূর্ত্তিমান হয়ে তাদের মুখে কথা কইছে। তারা এই দেবত্বের গর্ব্বে আমাদের ছাত্রদের স্বভাবতঃ অস্পৃশ্য ভেবে দূরে রেখে চলেন। এই দূর থেকে তারা ধীরে ধীরে আলগোচে আলগোচে ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষার দান বিতরণ কর্‌তে থাকেন এবং পাছে জাত যায় এবং শুচিতা নষ্ট হয় এই ভয়ে তারা তাদের নিজেদের এবং ছাত্রদের মধ্যে নোটবুকের প্রাচীর তুলে ব্যবধানের পর ব্যবধান রচনা করেন। এইরূপে অবজ্ঞার মধ্যে আমরা যে খাদ্য পাই তাতে রুচিও থাকে না এবং পেটও ভরে না। দুর্ভিক্ষের সময় সরকার বাহাদুর অনশন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যে রসদ বিতরণ করেন তাতে যেমন তুষ্টি হয় না কোনও ক্রমে প্রাণটা বাঁচে মাত্র এও ঠিক তাই। যে শিক্ষা মানুষের প্রয়োজনকে

অতিক্রম করে করে চলে এ সে শিক্ষা নয়। এ এমন কি আমাদের একান্ত প্রয়োজনের চেয়েও কম।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা একথা প্রমাণ করতে না পারব যে আমাদের নিয়ে বিশ্বের দরকার আছে আমাদের ছেড়ে সে টিকতে পারে না আমরা এ জগতে পরের সাধনার উপজীবি হয়ে একান্ত গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে আসি নি—আমরা ভিক্ষুক নহি এবং আমাদের দেনা পরিশোধ দেবার যোগ্যতা আছে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে পরের অনুগ্রহের অপেক্ষা করে থাকতেই হবে। কখনও অপেক্ষা করে, কখনও তোষামোদ করে কখনও বা দাসত্ব করে কিম্বা অপর কোনও না কোনও লাঙ্গুল সঞ্চালন বিদ্যার দ্বারাই আমাদের এই অনুগ্রহটুকু পেতে হবে।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা বিশ্বকে শ্রদ্ধার যোগ্য কিছু দিতে না পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদিগকে কিছু দিবার তরে কারও আগ্রহ থাকতে পারে না। কিন্তু এর তরে আমরা কাকে অপরাধী করব? যে মানুষ কেবল বেঁচেই থাকে কিছু উৎপাদন করতে পারে না তাঁকে নিখিল বিশ্বের সমগ্র পতিত ভূমি দান করলেও তার অন্ন সংস্থানের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তাহলে সমস্ত দেশটাকে আতুর-শালায় পরিণত করতে হয়। কঠোর হলেও এই সত্যটীকে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতেই হবে যে যদি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের কেউ দানও করে তাহলেও এইরূপ অবস্থায় আমরা সে দান বস্তুতঃ লাভ করতে পারব না। কেন না জলেই জল বাধে হ্রদই বৃষ্টির জলকে গ্রহণ করে রক্ষা করতে পারে মরুভূমিতে বৃষ্টির জল শুকিয়ে যায়। হ্রদের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ এবং দান এই দুই তত্ত্বই পাশাপাশি

আছে বলেই তার এই যোগ্যতা। যার আছে সেই পায়; তা না হলে দানেরও সম্মান থাকে না এবং যে গ্রহণ করে সেও অসম্মানিত হয়। কিন্তু আমরা ভিক্ষুবৃত্তিতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে আমরা এই সরল সত্যটীকেও উপলব্ধি করতে পারি না। পাছে সত্যশিক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে তুচ্ছ একটা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ি এই ভয়েই আমরা শঙ্কিত হয়ে থাকি। কেরাণীগিরির যোগ্যতার জন্য প্রস্তুত হবার পথে পাছে বিঘ্ন ঘটে এই ভয়ে আমরা সত্যশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা করতেও সাহসী হই না। ঘোড়ার পক্ষে গাড়ী যেমন আমাদের শিক্ষাও আমাদের পক্ষে ঠিক তেমনি। গাড়ী ঘোড়ার পক্ষে এক প্রকারের বন্ধন তাকে টান্‌লেই সে তার প্রভুর আস্তাবলে ঠাঁই এবং আহার পায় বটে কিন্তু গাড়ীর উপর মালিকের যে স্বাধীন অধিকার আছে ঘোড়ার তা' নাই, এরই তরে গাড়ীটা চিরকালই ঘোড়ার পক্ষে একটী বিভীষিকাময় ভার হয়ে থাকে। আমাদের শিক্ষাও আমাদের পক্ষে তাই হয়েছে। পেটের দায়ে প্রয়োজনের তাগিদেই একে আমরা বহন করে ফিরি।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কেমন করে জাতীয় জীবন থেকে জন্ম-লাভ করে একটা বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্রম বিকাশের দ্বারা গড়ে উঠে যথাকালে কার্য্যকরী হয় এবং কোন অবস্থার ফেরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয় তারই নজীর স্বরূপ আমি এইবার একটী ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।

ইউরোপে যে যুগকে তমিস্র যুগ বলে অভিহিত করা হয়—যখন বর্ব্বরদের আক্রমণে রোমের চিত্তপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়ে গেল সেই সময় পশ্চিম মহাদেশের মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডেই শিক্ষা মাথা তুলেছিল। ইউরোপের অপরাপর দেশ থেকে ছাত্ররা শিক্ষার উদ্দেশ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডে সমবেত হত। আমাদের সংস্কৃত পাঠশালার মত ছাত্ররা সেথায় বিনা খরচায় বাসস্থান, আহার এবং পুস্তক পেত। আইরীস্ সন্ন্যাসীরাই নির্ব্বাপিত প্রায় খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং খৃষ্টান সভ্যতার ধুমায়মান শিখাকে পুনর্জ্জীবিত করেছিল। চার্‌লমেন্ প্যারিসের বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের সময় ক্লেমেন্স নামক একজন আইরিস্ সন্ন্যাসীর সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। আইরিস্‌রা যে সে সময় সভ্যতার অনেক উচ্চতা লাভ করেছিল এর আরও অনেক প্রমাণ আছে। যদিও রোম এই সভ্যতার আদিভূমি তথাপি দীর্ঘকালব্যাপী মিলনের দ্বারা আইরিস্‌দের চিত্ত এবং জীবনের সহিত এ এমনি অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছিল যে একে সম্পূর্ণ ভাবে আইরিস্ বলেই ভ্রম হত এবং আইরিস্ ভাষাই এই সভ্যতার বাহন ছিল।

যখন ডেন্ এবং ইংরাজরা আয়ার্ল্যাণ্ড আক্রমণ করল তখন তারা আইরিস্ বিদ্যা-মন্দিরগুলিতে আগুণ ধরিয়ে ছিল—পাঠাগার নষ্ট করল এবং শিক্ষালয়ের শিক্ষক এবং ছাত্রদের হত্যা করল বা উৎপীড়ন করে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। এর পরও দেশের যে সব অংশ স্বাধীন রৈল এবং এই সব অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল সেখানে এখনও আইরিস্ ভাষাতেই শিক্ষার আদান প্রদান চল্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে এলাইজেবেথের সময় যখন আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পূর্ণ ভাবে ইংরাজের অধিকারে গেল তখনই সে তার স্বদেশী বিশ্ব-বিদ্যালয়

প্রকৃতপক্ষে হারাল। তারপর থেকে শিক্ষা ও অনুশীলনের ক্ষেত্র থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে আইরিস্ ভাষা ক্রমে ক্রমে অবজ্ঞেয় হয়ে দেশের ইতর শ্রেণীকে আশ্রয় করে বেঁচে রৈল মাত্র। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে আবার জাতীয় বিদ্যালয়ের অন্দোলন আরম্ভ হ'ল। আইরিস্‌রা তাদের শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা বশে এই আন্দোলনকে সাগ্রহে বরণ করে ছিল। এ্যাংগ্লো-সাক্সন্—ছাঁচে আইরিস্‌দের গড়ে তোলাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু ভালর তরেই হউক কিম্বা মন্দর তরেই হউক বিধাতা ভিন্ন ভিন্ন জাতকে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় সৃষ্টি করেছেন; তাদের একজন যদি আর একজনকার জামা পরে তা বেমানান্ না হয়ে থাক্‌তে পারে না। যখন এই আন্দোলন সূচিত হল তখন শতকরা ৮০ জন আইরিস্ মাতৃভাষা ব্যবহার কর্‌ত; কিন্তু দণ্ডের ভয় দেখিয়ে একান্ত জবরদস্তি করেই তাদের মাতৃভাষা এবং স্বদেশের ইতিহাস আলোচনা ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য করা হয়েছিল।

এর পরিণাম যে শোচনীয় হয়ে ছিল তার উল্লেখ মাত্রই বাহুল্য। সমস্ত দেশের মন যেন একেবারে মন্ত্র-বলে অসাড় হয়ে গেল। আইরিস্ ছাত্ররা এই সব বিদ্যালয়ে সজীব বুদ্ধিবৃত্তি এবং শিক্ষার কৌতূহল নিয়ে প্রবেশ কর্‌ত; কিন্তু সেখান থেকে যখন বের হত তখন তাদের বুদ্ধি পঙ্গু হয়ে যেত এবং শিক্ষার রুচিও লোপ পেত। এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে উৎপন্ন হ'ত তোতাপাখী।

এক দেশের অবস্থা কখনও অপর দেশের সমান হতে পারে না। ইংরাজ আয়ার্ল্যাণ্ডে শিক্ষার যে প্রণালী অবলম্বন করেছিল ভারতে সে ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বন না করেও থাক্‌তে পারে; কিন্তু

তার পরিণামের মধ্যে যেন এক জায়গায় একটী সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায় সেটী হচ্ছে এই যে আমাদের চিত্ত আমাদের শিক্ষার মধ্যে ধরা পড়ে না। আমাদের নিজেদের মন বলে যে একটী জিনিষ আছে এই শিক্ষা ব্যবস্থাতে তাকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়; অর্থাৎ আমাদের দেশে শিক্ষার যে সব খাল কাটা হয় তাতে কর্ত্তাদের দক্ষতার যে পরিচয় পাই তাতে বিস্মিত হতে হয় বটে এবং তার খরচও খুব বেশী হয়ে পড়ে; কেবল তাতে অভাব থাকে জলের। তার ফল এই হয় কর্ত্তারা জলের দোষ দেন এবং আমরা জলের পক্ষ নিয়ে কর্ত্তাদের দোষ দিই। ইতিমধ্যে খাল থেকে যায় শুষ্ক। কর্ত্তাদের পাছে ক্রোধের উদ্রেক হয় এই আশঙ্কায় আমার বল্‌তে সঙ্কোচ হচ্চে বটে; কিন্তু এ সম্বন্ধে সত্য গোপন কর্‌তেও প্রবৃত্তি হয় না। সেই সত্যটী এই যে দেশের স্বাভাবিক পয়োপ্রণালীকে রুদ্ধ করা হয়েছে বলেই দেশও এইরূপে প্রতিশোধ তুলছে।

৭ম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পরভাষার মধ্য দিয়ে দেশের শিক্ষা যে সফলতা লাভ কর্‌তে পারে না এ কথাটি স্বতঃসিদ্ধ। অপর কোনও দেশে এ সম্বন্ধে কোনও তর্কই উঠ্‌ত বলে অনুমান হয় না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটী প্রচলিত মতের বিরোধী হয়ে পড়ায় এর উল্লেখ মাত্রেই আমাদের শ্লেষ্মাপ্রধান আত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠে

তাহলেও সত্য মাত্রেই উপাদেয়। তার উল্লেখে আর যাই হৌক তাতে কারও বস্তুতঃ কোনও ক্ষতি হতে পারে না। এই বিশ্বাসে অনেকের অপ্রিয় হলেও আমি একথা বল্‌তে সাহসী হচ্ছি যে যখন আমরা ইংরাজি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হই তখন সেই ভাষার দুয়ারে ঘা দিতে দিতে আর তার চাবি খুল্‌তেই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটী কেটে যায়। ঘরের ভিতরে ভোজনের সকল আয়োজন প্রস্তুত হয়ে থাক্‌তে পারে কিন্তু সেই ঘরে প্রবেশ কর্‌তে আমাদের যে কষ্টভোগ এবং কালবিলম্ব কর্‌তে হয় তাতে ভোজনের রুচি চলে যায় এবং দীর্ঘ উপবাসের দ্বারায় পেটেরও হজম শক্তি হ্রাস পেয়ে আসে। ব্যাকরণের সূত্র এবং শব্দের বানান চিবুতে চিবুতেই চোয়াল ধরে আসে—শিক্ষার যা আসল রস ভাব তা' যখন অবশেষে গ্রহণ কর্‌বার সময় আসে তখন তা গ্রহণ কর্‌বার রুচিও ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

যদি কেহ বালুময় জলহীন মরুভূমির উপর বৃক্ষরোপন কর্‌বার সংকল্প করে তাকে যে শুধু দূর থেকে বীজ আহরণ কর্‌তে হবে তা' নয়; তাকে মাটি এবং জলও দূর থেকে বহন করে আন্‌তে হবে। এইরূপ কষ্ট স্বীকার করবার পর যদি বা মরুভূমিতে গাছ গজায় তা' নিশ্চয়ই খর্ব্ব হয়ে জন্মাবে! তাতে যদি ফলও ধরে তথাপি সে ফল থেকে কখনই বীজের উদ্ভব হবে না। আমরা আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে যে শিক্ষা-লাভ করি তা' এই মরুভূমির আবাদের শস্যেরই অনুরূপ। এখানে শুধু যে জ্ঞান এবং আদর্শ বিদেশ থেকে আন্‌তে হয় তা' নয়; ভাষাটী পর্য্যন্ত সাত সমুদ্র তের নদী পার করে না আমদানী করলে এখানে চলে না। এর ফলে আমাদের শিক্ষা

যেমনি অস্পষ্ট তেমনি দূর ও অসত্য হয়ে পড়েছে—এর সহিত আমাদের জীবন যাত্রার কোনও যোগ নাই। সময়—স্বাস্থ্য এবং অর্থের দিক থেকে এ আমাদের পক্ষে অসম্ভবরূপে ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে; কিন্তু এর থেকে যে ফল পাই তা শূন্যতা ভিন্ন অপর কিছুই নয়।

শিক্ষকতা সম্বন্ধে আমার যে টুকু অভিজ্ঞতা আছে তাতে আমার বোধ হয় অধিকাংশ ছাত্রেরই ভাষা শিক্ষা কর্‌বার শক্তি নাই। এই শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে ইংরাজি ভাষার মধ্য দিয়ে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হওয়া যদিও সম্ভব হয়; কিন্তু তার পরবর্ত্তী উচ্চতর সোপানে তাদের ভাগ্যে দুর্দ্দৈব-ঘটনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ভারতীয় ছাত্রের দ্বারা ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত করার পক্ষে অনেক বাধা দেখ্‌তে পাই। আমাদের যে মন আজন্ম মাতৃভাষায় চিন্তা করে তার মধ্যে এই বিদেশী ভাষাকে প্রবেশ করানর চেষ্টা দেশী খাঁড়ার খাপে বিলাতী তলোয়ার প্রবেশ করানর চেষ্টারই অনুরূপ। তা' ছাড়া ইংরাজিতে পারদর্শী শিক্ষকের সহায়তা পাওয়া আমাদের শিক্ষার প্রথমাবস্থায় অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে না বলে আমাদের ভিত্‌টা প্রায়ই কাঁচা এবং বিকৃত হয়ে থাকে। অতএব রামায়ণের হনুমান বিশল্যকরণী চিন্‌ত না বলে তাকে যেমন সমগ্র গন্ধমাদন পর্ব্বতটা ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল আমাদের ছাত্রদেরও সেই দশা হয়—ভাষার ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অগত্যা তাদের সমস্ত পুস্তকটাকে আদ্যন্ত মাথার মধ্যে বহন করে ফির্‌তে হয়। যাদের অসামান্য মেধা এমন দু'একজন এই অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত যায় বটে; কিন্তু সাধারণ ছাত্রদের কাছে এতটা প্রত্যাশা করা অন্যায়।

এখন কথা হচ্ছে এই যে জন্মাবধি—সঞ্চারিত স্বভাবের কোনও বিকলতা—বলে হউক কিম্বা দৈব-দুর্ব্বিপাকেই হউক যে সব ছাত্র ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত কর্‌তে পারে না তাদের এই অপরাধ কি এতই গুরুতর যে তাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে একেবারে চিরতরে নির্ব্বাসিত কর্‌তে হবে। এক সময়ে ইংলণ্ডে চোরের ফাঁসি হত। আমার বোধ হয় আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই আইন তার চেয়েও কঠোরতর। এখানে চুরি কর্‌তে না পারার তরে নির্ব্বাসন দেওয়া হয়। যদি কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে পরীক্ষাগারে বই নিয়ে যাওয়া দোষাবহ হয় তাহলে মস্তিষ্কের ভিতর একটা বই পুরে নিয়ে যাওয়া কেন যে দণ্ডনীয় হবে না আমি বুঝতে পারি না।

যারা মুখস্থ করে কোনও গতিকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সেই সব ভাগ্যবান ছাত্রদের অভিযুক্ত করা আমার অভিপ্রেত নয়; কিন্তু যারা পিছু পড়ে থাকে তাদের পক্ষে যদি হাওড়ার পুলের উপর যাতায়াত করা নিষিদ্ধ হয়েও যায় তাহলেও তাদের পারাপারের তরে একটা খেয়া ষ্টীমার কিম্বা একটা দেশী খেয়া নৌকারও ব্যবস্থা করা উচিত নয় কি? যারা কেবল মাত্র ইংরাজি ভাষা আয়ত্ত কর্‌তে পার্‌ল না অথচ যাদের শিক্ষার ইচ্ছা আছে এবং শিক্ষার অপর বিষয় আয়ত্ত কর্‌বার যোগ্যতাও আছে এমন হাজার হাজার ছাত্রকে শিক্ষার সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে আমরা জাতীয় শক্তির যে অপব্যয় কর্‌ছি তা ভাব্‌লেও স্তম্ভিত হতে হয় এবং তার পাপ যে প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় পুঞ্জিত হচ্ছে একথা বলাই বাহুল্য। এইখানে এই কথা উঠ্‌তে পারে:—"তুমি দেশী ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দেব বল্‌ছ; কিন্তু দেশী ভাষায় উচ্চ শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য গ্রন্থ যে নাই সে কথা

স্মরণ করেছ কি ?" এর উত্তর এই যে আমি জানি দেশী ভাষায় যতদিন পর্য্যন্ত উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না হয় ততদিন দেশী ভাষায় উচ্চ শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ রচিত হতেই পারে না। যে টাকার প্রচলন নাই এমন টাকা টাক্‌শালে তৈরি হবে এ প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

৮ম পরিচ্ছেদ।

আয়ার্ল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা আর একটী শিক্ষা-লাভ করতে পারি। আগে জলের সঞ্চয় হলে তবে তাতে যেমন মাছ আসে তেমনি প্রকৃত শিক্ষক থাক্‌লে তবে তাদের দিকে ছাত্ররা আকৃষ্ট হয়। প্রকৃত শিক্ষাই তখন ছাত্রদের লক্ষ্য হয়। তখন আর তাদের তক্‌মার লোভ থাকে না। বাজার দরের ছাপ পিঠের উপর মুদ্রিত করে দিতেও তাদের আর প্রবৃত্তি হয় না।

একদা মানসিক উন্নতির যুগে যখন ভারতবর্ষে এমন লোক ছিল যাদের চিত্ত চিন্তা এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকত তখনই ভারতে নালন্দা এবং তক্ষশীলার ন্যায় শিক্ষা-কেন্দ্র স্বভাবতঃ গঠিত হয়ে উঠেছিল। এখন যে হেতু ছাপ নেওয়াই আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হয়েছে সেই জন্যই আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে উল্টা দিক থেকেই আরম্ভ করি—প্রথমে শিক্ষকের যোগাড় না করে ছাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত হই। এ ঠিক ল্যাজের দিক থেকে মুর্ত্তি গড়ারই অনুরূপ

কিম্বা প্রথমে পাত করে অভ্যাগতদের বসিয়ে দিয়ে রান্নার যোগাড় করতে যাওয়ার মতই হাস্যকর। তখন কাজেই নিমন্ত্রিতদের মন ভুলাবার তরে ভোজ্যতালিকাকে অতি রঞ্জিত করতে হয়। ওরে এ জিনিসটা আন ও জিনিসটা আন বলে কেবলি চিৎকার করতে থাকি কিন্তু কোনও জিনিসই এসে জুটে না—আমরা তখন একথা ভুলে যাই যে শুধু চিৎকার করে শূন্যতাকে ঢাক্‌তে পারা যায় না এবং চিৎকারে পেটও ভরে না।

যখন ছাত্র সংগ্রহের তরে আমরা অতীব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি তখন মানুষের মন ভুলাবার ছলা কলার দরকার হয়ে পড়ে—তা' না হলে চার জমে না। তখন একরাত্রের মধ্যে আমাদের সুদীর্ঘ পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করে তুল্‌তে হয়—তখন বিদেশীর প্রতি লোকের ভক্তি আকর্ষণ করতে হয়—তখন মানুষের মনকে পথভ্রষ্ট এবং বিশৃঙ্খল করে দেবার তরে নানাবিধ মায়া জাল বিস্তার করাই আমাদের কাজ হয়ে পড়ে।

আমাদের মনকে মত্ততার হাত থেকে বাঁচাবার তরে এবং আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষার তরে পাঠ্যতালিকার বিস্তারের এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্বেগকে দূর করে দিতে হবে এবং আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে হবে।

তারপর যারা তপস্যা দ্বারা নিজেদের চিত্তকে উৎকর্ষিত করেছেন—যারা জ্ঞান রাজ্যে সৃষ্টি কর্‌বার ক্ষমতা লাভ করেছেন—এক কথায় যারা বিদ্যাদান কর্‌বার যোগ্য হয়েছেন সেই সব মনিষীদের সমবেত করে সত্য সন্ধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত করতে হবে। এই পথেই আমরা সেই শক্তি লাভ কর্‌ব যার দ্বারায় সত্যকার বিশ্ব-

বিদ্যালয় আমাদের ভিতর থেকে স্বতঃই সৃষ্ট হয়ে জীবনের সত্যের মধ্যে সার্থক হবে।

আমাদের একথা বুঝ্‌তেই হবে যে দেশের চিত্ত-শক্তিকে এই ভাবে সংহত করাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ; কেননা ইহাই সৃষ্টি-শক্তির যথার্থ কেন্দ্র এবং এই খানেই দেশের শক্তি সমূহ দানা বেঁধে উঠ্‌বে।

৯ম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অনেকে বলেন ভারতবর্ষে বহু ভাষা প্রচলিত থাকায় এখানে এইরূপ চিত্তের একতা আনয়ন করা খুবই দুরূহ এমন কি অসম্ভব বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

আমি একথা মানি কিন্তু সকল জাত্‌কেই সার্থকতা লাভ কর্‌বার তরে একটা না একটা গুরুতর সমস্যার সমাধান কর্‌তে হয়েছে—যে জাত তাতে অকৃতকার্য্য হয়েছে তারা অধঃপাতে গেছে। সকল সভ্যতাই দুরূহতার মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে। যে গ্রামে নদী আছে সেখানের জলের সচ্ছলতা আপনিই হয়; কিন্তু যেখানে নদী নাই সেখানের অধিবাসিরা যদি শুধু তাদের হিংসা কর্‌তে থাকে তাহলে তাদের নিজেদের জলকষ্ট নিবারণ হয় না—এর তরে কুপ খনন কর্‌বার কষ্টকে তাদের স্বীকার কর্‌তেই হবে। ধুলি সুলভ বলে তার দ্বারা জলের কাজ মিটাবার চেষ্টা পাগলেই করে থাকে।

আমদের দেশের ভাষায় বহুতর অসুবিধা আমাদের স্বীকার কর্‌তেই হবে এবং একথাও স্বীকার কর্‌তে হবে যে বিদেশ থেকে মাটি এনে টবের একটা আধটা সখের ফুলগাছ তৈরি সম্ভব হতে পার্‌লেত তা দিয়ে দেশের ধান চাষ যার উপর দেশের জীবন নির্ভর করে তা' কখনও হতে পারে না।

ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত। এ সত্ত্বেও ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে আমরা একটা ঐক্য দেখ্‌তে পাই। অতএব ইহা বেশ বুঝা যাচ্ছে যে সভ্যতার ঐক্য ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করে না।

ইউরোপীয় সভ্যতার আদি যুগে ল্যাটিন্ তাহার বাহন ছিল। এই যুগে তার জ্ঞানপুষ্প মুকুল—অবস্থাতেই ছিল অর্থাৎ তার আত্ম-বিকাশের দলগুলি তখন একই বিন্দুর মধ্যে মুদ্রিত হয়ে ছিল। তার ভাষার সেই একতা তার মানসিক বিকাশের পূর্ণতার নিদর্শন নহে। যখন ইউরোপের প্রদেশ সকল নিজ নিজ ভাষাকে আশ্রয় কর্‌ল তখনই তাদের চিন্তা ও জ্ঞানের সম্মিলনে ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি সম্ভব হল এবং এই বৈচিত্র থেকেই তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান এমন বিস্তৃত এবং সচল হয়ে উঠতে পেড়েছে। স্বভাবগত বৈচিত্র যখন সামঞ্জস্য—লাভ করে তখনই বাস্তবিক সত্যকার ঐক্য সম্ভব হয়। কৃত্রিম একতা জড়তার সৃষ্টি করে মাত্র। আজ যদি ফরাসী, ইতালী, জার্ম্মাণী এবং ইংলণ্ড ইউরোপীয় সভ্যতার সাধারণ ভাণ্ডারে তাদের নিজ নিজ অর্জ্জিত জ্ঞানের অংশ দেওয়া রহিত করে তাহলে ইউরোপীয় সভ্যতার যে ক্ষতি হবে তা' কল্পনা কর্‌লেও স্তম্ভিত হতে হয়। জার্ম্মাণী যখন ইউরোপীয় সভ্যতার

উপর একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা কর্‌ছিল তখন তার সেই উদ্যোগ এই কারণেই ইউরোপের অন্যান্য দেশের চক্ষে সঙ্কট বলে বিবেচিত হয়েছিল।

আমাদের দেশেও এমন একটী সময় ছিল যখন সংস্কৃত ভাষা ভারতবর্ষের শিক্ষার একমাত্র বাহণ ছিল। কিন্তু আজ ভাবের হাটে ব্যাপার জমাবার তরে তার প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে পরিপুষ্ট করে তোলা তার পক্ষে একান্তই দরকারী হয়ে পড়েছে। এই প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়েই তার বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ নিজ নিজ প্রতিভার বৈচিত্রকে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে তুল্‌তে পার্‌বে। এ কাজ পরের ভাষায় কখনই সম্ভব হতে পারে না। পরের ভাষায় এমন অনেক বিশেষত্ব আছে যা' আমাদের চিন্তা এবং চেষ্টার স্বাধীনতাকে পদে পদে বাধাগ্রস্থ কর্‌তে থাকে। আমরা যখন ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করি তখন আমাদের মন স্বভাবতঃই ভাবের তরেও পশ্চিমের মুখ তাকিয়ে থাকে; কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের এই পথ চাওয়াই সার হয়—ভাবের নাগাল পাই না। এরই তরে আমাদের শিক্ষা হয় বন্ধ হয়ে থাকে না হয় কেবলি অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে যে ভাষার পার্থক্য আছে তাতে ভয় পাবার কারণ নাই এবং সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে আমাদের শিক্ষার জন্য ইংরাজি ভাষা আমদানী করার ব্যর্থতার সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আমাদের একান্তই প্রয়োজন। ইংরাজি ভাষা তার উৎপত্তি স্থলে সচল এবং তরল বটে; কিন্তু এই দূর পথ অতিক্রম করে আস্‌তে আস্‌তে সে যে শুষ্ক, বদ্ধ এবং কঠিন হয়ে পড়ে একথাটী আমাদের বুঝবার দরকার আছে।

অবশ্য আজই যে আমরা ইংরাজি ভাষায় চাকরীর দরখাস্ত লেখা থেকে বিরত হতে পার্‌ব কিম্বা আজই যে আমরা রাজ কার্য্য থেকে অবসর নিতে পার্‌ব আমি এমন আশা কল্পনা কর্‌তেও পারি না। আমাদের স্বীকার কর্‌তেই হবে যে ইংরাজি রাজ—ভাষা হওয়ায় এ কৃত্রিম শুল্কের মত আমাদের মাতৃ-ভাষাকে জবরদস্তি করে শিক্ষা-ক্ষেত্র হতে গৃহস্থালীর ব্যবহারের মধ্যে নির্ব্বাসিত করে দিয়েছে।

আবার এই কারণেই বিদেশী শাসন-যন্ত্রের এমন অনেক ব্যয়-সাধ্য ভার আমাদের বহন করতে হয় যা দেশের জন সাধারণের কোনও কাজেই আসে না। একটা সামান্য কথাকেও সরকারের শ্রুতিগোচর করতে দেশের অধিকাংশ লোককেই ইংরাজি নবীশকে রসুম দিতে হয়। আমার অনুমান জগতের মধ্যে কেবল ভারতবর্ষেই সরকারের কৃষিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এমন ভাষায় তাদের কার্য্য-বিবরনী প্রকাশ করেন যে ভাষায় দেশের কৃষিজীবিদের আদৌ অভিজ্ঞতা নাই। এটা একপ্রকারের বিদ্রূপ; কিন্তু তা বলে একে হেসে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না; কেননা যাদের উপর এই বিদ্রূপ করা হয় তাদের কাছ থেকেই এর খরচ আদায় করা হয়। দেখতে পাই দেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর সুবিধার খাতিরে বাঙ্গলা ভাষা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করবার জন্য আমাদের সরকার অজস্র অর্থব্যয় করে থাকেন কিন্তু এই যে ত্রিশ কোটি লোক যারা এই দেশের অধিবাসী—যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে পরিশ্রম করে দেশের শাসন—ব্যয় নির্ব্বাহ করে তাদের জন্য ইংরাজি ভাষায় লিখিত সরকারী আইন কানুনকে তাদের বোধগম্য করবার

কোনও ব্যবস্থাই দেখি না। সরকারী আইনকানুন পরভাষার অন্তরালে তাদের কাছে চিরকালই পরদানসীন থেকে যায়। রেলওয়ে ষ্টেসনে যখন ষ্টেসনের নাম দেশী ভাষায় লিখিত দেখি তখন কর্ত্তাদের কর্ত্তব্য বোধের এই ভগ্নাবশেষ টুকুতে আর ও বিস্মিত হতে হয়। এই সব দেখে শুনে বেশ বুঝতে পারা যায় যে আমাদের যারা শাসন করছেন তারা একদিকে তাদের কর্ত্তব্যভারকে যেমন যথা সম্ভব লঘু করেছেন আর একদিকে তেমনি আমাদের দায়ভারকেও অযথারূপে বাড়িয়ে গুরুতর করে তুলেছেন—এ ঠিক গণ্ডস্য উপরি বিস্ফোটকং।

যাই হোক এই থেকে আমরা এক অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে উপস্থিত হয়েছি— আমাদের মাতৃভাষা আমাদের উন্নতির অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আমরা তাই ইংরাজি ব্যাকরণের সূক্ষ্ম সূতার উপর দিয়ে চল্‌তে পারলেই গর্ব্বিত হয়ে উঠি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে সব সাংঘাতিক দোষ আছে শুধু এরই তরে তাদের উপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের অন্য গতি থাকে না এবং পরিণামে যখন রুটির পরিবর্ত্তে লোষ্ট্র লাভ হয় তখন কৃতজ্ঞ অন্তরেই তা গ্রহণ করতে হয়। আমরা বর্ত্তমান শাসন-কার্য্যের ব্যয়ের তরে শুধু যে রাজস্ব দিয়েই নিষ্কৃতি পাই তা নয়—এর জন্য আমাদের দেশের ভাষা এবং দেশের সভ্যতাকেও বলি দিতে হয়েছে। এই দেশের ভাষা এবং দেশের সভ্যতার উদ্ধারের উপরেই যে আমাদের মুক্তি সম্পুর্ণভাবে নির্ভর করছে একথা আমাদের বুঝতেই হবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমুল্যরতন প্রামানিক।

পত্র

——ঃ*ঃ——

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যনীয়েষু

কিঞ্চিৎ দেরিতে হলেও, তুমি যে মনে করে, চিঠির মারফৎ আমাকে তোমার বিজয়ার প্রণাম পাঠিয়েছ তাতে আমি যথার্থই খুসি হয়েছি, কেননা দেখতে পাচ্ছি এই এক বৎসরের মধ্যে আমার অধিকাংশ যুবক বন্ধুই আমার অস্তিত্ব ভুলে গেছেন। ভুলে যে গিয়েছেন তার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোনই অভিযোগ নেই আমাদের মত মাত্র-লেখকদের এক সাহিত্যিক অস্তিত্ব ছাড়া অপর কোনও অস্তিত্ব নেই। সেকালের ভাষায় বলতে গেলে, আমরা হচ্ছি সব "বাক্যকায়"। নীরব হলেই আমাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। আমরা আছি শুধু দেশের শ্রুতির মধ্যে তার স্মৃতি পর্য্যন্ত পৌঁছবার্ শক্তি আমাদের বাক্যদেহ ধরে না।

প্রণামান্তে তুমি আমার কাছে আমার সাংবাৎসরিক নীরবতার কৈফিয়ত তলব করেছ। তোমার প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে আমি তোমাকে একটি পাণ্টা প্রশ্ন করছি। সেই প্রশ্নই হবে আমার উত্তর।

মানুষে কথা কয় কেন সেইটিই কি আসল জিজ্ঞাস্য নয়? দেহ প্রাণের নৈসর্গিক যোগ রক্ষা করবার জন্য মানুষ মাত্রেরই পক্ষে যথেষ্ট অন্ন চাই। মানবদেহের কেন্দ্র যে উদর মানুষ মাত্রেরই চোখ তার সাক্ষী। তার পর দেহের সঙ্গে বস্ত্রের কোনও নৈসর্গিক যোগ না থাকলেও, সভ্য মানবের পক্ষে কিঞ্চিৎ বস্ত্রও চাই। এ পৃথিবীতে আমরা কাপড় পরে না এলেও এখানে এসে কাপড় পরি।

বস্তু মানবজীবনে একটা প্রক্ষিপ্ত পদার্থ হলেও—ক্ষিপ্ত না হলে মানুষে তা প্রক্ষেপ কর্‌তে পারে না, কেননা মানুষের সনাতন সমাজ বন্ধন হচ্ছে বস্ত্রের বন্ধন, ভাষায় যাকে বলে গাঁঠছড়া। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মানুষ এ পৃথিবীতে কেন আসে? এ দার্শনিক প্রশ্নের সহজ ও চূড়ান্ত উত্তর—খেতে-পরতে ও মরতে। সুতরাং এই খাওয়া পরা ও মরার সংস্থান করতে যে কটি কথা কওয়া দরকার সেই কটি কথা বলাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে যুগপৎ স্বাভাবিক ও সঙ্গত। উপরন্তু একটি কথা বলা কারও পক্ষে উচিত কি না জানিনে, তবে অধিকাংশের পক্ষে যে অকর্ত্তব্য তা ভুক্তভোগী শ্রোতা মাত্রেই জানেন। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে চুপ করে থাকায় কারও কোনও লাভ লোকসান নেই। অপর পক্ষে বেশির ভাগ লোকের পক্ষে বেশি কথা কওয়াটা একটা সামাজিক উপদ্রব বিশেষ। এই যখন আমার ধারণা তখন বর্ত্তমানে কেন যে আমার বাকরোধ হয়েছে তার লম্বা কৈফিয়ত দেবার কি কোনও প্রয়োজন আছে?

তবে তোমরা যে সে কৈফিয়ত চাও তার কারণও স্পষ্ট। এ কালের যুগ ধর্ম্ম হচ্ছে বাচালতা। কাযেই তোমরা না ভেবেচিন্তে ধরে নিয়েছ যে যে-দেশের যত বেশি লোক যত বেশি কথা কয় আর যত বেশি লোক তা হাঁ করে শোনে সে দেশ তত সভ্য হয় তত উন্নত হয়, এক কথায় তত তার progress হয়। ফলে জাতির পক্ষে পরম পুরুষার্থ হচ্ছে একদিকে সংবাদপত্রের প্রকাশ ও প্রচার বৃদ্ধি করা আর একদিকে বক্তার সংখ্যা ও বক্তৃতার দৈর্ঘ্য বাড়ানো। এ যুগে পৃথিবীতে শব্দ যথার্থই ব্রহ্ম হয়ে উঠেছে। এই যুগধর্ম্ম

অনুসরণ করে মানব সভ্যতা যে চরমে শব্দব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এরূপ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভে সকলের সমান লোভ হয় না। অনর্গল কথন ও অবিরাম শ্রবণের মহা দোষ এই যে এ ব্যাপারে বক্তারা বক্তৃতা করবার পূর্ব্বে চিন্তা করবার অবসর পান না এবং শ্রোতারা শ্রবণ করবার পরে তা বিচার করবার অবসর পান না। ফলে রসনা মস্তিষ্কের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হয়ে একমাত্র উদরমূল হয়ে পড়ে। তখন মানুষের আদিম ভাবনা, পেটের ভাবনা, তার একমাত্র ভাবনা হয়ে দাঁড়ায় এবং মানব সমাজ বৈশ্য সমাজ হয়ে পড়ে। সভ্যজগতে আজ হয়েছেও তাই। সে জগতে ব্রাহ্মণ শূদ্র দুই আজ বৈশ্যেরই এপিঠ আর ওপিঠ। যদি জিজ্ঞাসা করো যে ক্ষত্রিয় নেই কেন? তার উত্তর গত যুদ্ধে পৃথিবী নিক্ষত্রিয় হয়েছে। এরূপ যে হয়েছে তার কারণ এ যুগে ক্ষত্রিয় হয়ে পড়েছিল ধর্ম্মের নয় অর্থের, ব্রাহ্মণের নয় বৈশ্যের বশ। এ যুগের আদর্শ হচ্ছে ডিমোক্রাসি অর্থাৎ সেই সমাজ যাতে মানুষের মনের চরিত্রের জাতিভেদ আর থাকবে না। অর্থাৎ মানবসমাজে অধিকারীভেদ আর থাক্‌বে না, কিন্তু অধিকারভেদ আরও বাড়্‌বে। একমাত্র কথার সাহায্যে এই আদর্শের দিকে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। আজকের দিনে সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধ যে বাগযুদ্ধ আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসা যে কথার ব্যবসা—এ ত মর্ত্তলোক-প্রসিদ্ধ শ্রুতিকটু সত্য। আমার এসব কথা শুনে তুমি হয় ত চমকে উঠবে আর মনে ভাববে যে আমার মতভ্রংশ ঘটেছে। Demos জাগছে দেখে মরা বেঁচে উঠছে দেখে, আমি ভয় খেয়ে গিয়েছি ফলে ডিমোক্রাসি সম্বন্ধে আমার মত এখন অমত হয়ে

গিয়েছে। কিন্তু আসলে ঘটনা তা নয়। মনো-জগতে আমি কোন রকম বাজি জানিনে, এমন কি ডিগবাজিও নয়। আমি গণতন্ত্রের বিপক্ষে নই মনতন্ত্রের স্বপক্ষে। গণতন্ত্র যদি মনতন্ত্রের বিরোধি হয়ে ওঠে তাহলে আমাকে অগত্যা জনগণকে ছেড়ে মহাজনের শরণাপন্ন হতে হবে। কিন্তু এ বিরোধ জন্মাবার কোনই কারণ নেই। উদরের মর্ম্ম আমি জানি কিন্তু তার ধর্ম্ম আমি মানিনে। ক্ষুধার শক্তি প্রলয়ঙ্করী সৃষ্টিকরী নয়। উদর অন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে কিন্তু রসনা তার মীমাংসা করতে পারে না। এইহেতু আমার বিশ্বাস যে একটা সমগ্র জাতির পক্ষে রসনার জোর আস্ফালনটা সুধু অনর্থক নয় অনর্থকরও বটে। Demos যদি Demosthenes হয়ে ওঠে, তাহলে কার না মনের ধাত ছেড়ে যায় ?

কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে এই জাতীয়-বকুনিটে হচ্ছে একটা বিলেতি রোগ। অতএব ওর হাত থেকে বাঁচা কঠিন। বিলেতি রোগ এদেশে একবার এলে দেখতে না দেখতে তা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে ও কায়েম হয়। এক কথায় বিলেতি epidemic এদেশে এসে endemic হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ ইনফ্লুয়েঞ্জা ওরফে যুদ্ধজ্বরের নাম করা যেতে পারে। তারপরে বিলেতি রোগে সাদা লোক তেমন মরে না যেমন মরে কালা আদমি। যে যুদ্ধ থেকে জন্মালো যুদ্ধজ্বর সেই যুদ্ধে ইউরোপে যত লোক না মারা গেল তার দশগুণ মারা গেল এ দেশে যুদ্ধজ্বরে। এখন এই বকুনিটে যে শুধু বিলেতি নয়, উপরন্তু বিষম রোগ তার প্রমাণ, ইউরোপ মরতে বসেছিল এই বকুনির চোটে। শান্তির সময়ে ইউরোপের লোলুপ রসনা যুদ্ধের জন্য লেলিহান হয়ে পড়েছিল, আর যুদ্ধের পর সেই

লেলিহান রসনা শান্তির জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে। এই বকুনি বেজায় সংক্রামক আর দুনিয়ার যত সংক্রামক রোগ বিশেষ করে ঠেসে ধরে আমাদেরই। এবং তার সমস্ত লক্ষণ একসঙ্গে দেখা দেয় আমাদেরি শরীরে। ইউরোপে এই রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ ছিল যুদ্ধ পিপাসা আর তার পর লক্ষণ হয়েছে শান্তি পিপাসা আমরা একসঙ্গে ও দুয়ের সমন্বয় করে নিয়েছি। আমাদের রসনা এখন লালায়িত হয়েছে শান্ত-যুদ্ধের জন্য।

এ বিলেতি রোগের অবশ্য একটা অব্যর্থ দেশী ওষুধ আছে। এবং সে ওষুধ প্রয়োগ করতে পারতেন এমন একটি মহাপুরুষও ভারতবর্ষে এখন অবতীর্ণ হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী যখন স্বজাতির তন-মন-ধন থেকে বিলেতি সভ্যতা নামক রোগ দূর করতে ব্রতী হয়েছেন, তখন তাঁর কর্ত্তব্য ছিল, দেশের লোককে অন্তত এক বৎসরের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করতে আদেশ দেওয়া। সে ব্রত অবলম্বন করলে বছর না পেরুতে আমরা স্বদেশের স্বরাজ্য হয়ত লাভ করতে পারতুম না কিন্তু স্ব-মনের স্বরাজ্য অনেকটা লাভ করতুম। আর উক্ত উপায়ে বাহ্য স্বরাজ্য যে একেবারেই লাভ করতে পারতুম না, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। হট্টগোলে মানুষের মাথা খারাপ হয় কিন্তু ঘোর নিস্তব্ধতায় মানুষে ঘোর ভয় পায়। জ্ঞাতর চাইতে অজ্ঞাত, ব্যক্তর চাইতে অব্যক্ত, আলোর চাইতে অন্ধকার, জীবনের চাইতে মৃত্যু যে ঢের বেশি ভয়ঙ্কর এ ত মানুষ মাত্রেই জানে। সুতরাং নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত আমাদের জাতীয় আত্মা যদি বৎসরাবধিকাল নিস্তব্ধ হয়ে থাকতে পারত তাহলে ইংরাজরাজ যে অসম্ভব রকম অস্থির

হয়ে পড়তেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি কথা বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি নে। ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ভারতের বিশেষ বাণী কি? এ প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি নীরব হয়ে থাকতুম অর্থাৎ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতুম যে ভারতের গীর্ব্বাণী হচ্ছে—নির্ব্বাণী।

বক্তারা আমার এ সব কথার কি জবাব দেবেন তা আমি জানি। তাঁরা বলবেন যে তাঁরা বক্তৃতা করেন ইংরাজ রাজাকে ডরিয়ে দেবার জন্য নয়, দেশের লোককে জাগিয়ে তোলবার জন্য। এবং সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও করবেন যে বিলেতি যুদ্ধজ্বর থেকে দেশের লোককে রক্ষা করতে গিয়ে কি স্বদেশী Sleeping sickness এর প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য? অবশ্য নয়। রোগ মাত্রেই মারাত্মক তা' দেশীই হোক আর বিদেশীই হোক। তবে দেশী রোগ থেকে অব্যাহতি পেতে হলে যে বিদেশী রোগকে অঙ্গীকার করতে হবে এমন কোনও বিধির নিয়ম নেই। তা ছাড়া নীরবতার সঙ্গে নিদ্রার ও সরবতার সঙ্গে সজাগতার সম্বন্ধ নৈসর্গিকও নয়; অবিচ্ছেদ্যও নয়। মানুষে জেগেও চুপ করে থাকতে পারে আর ঘুমেও বকে। বক্তাদের এখানে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে কথা কয়েও মানুষকে ঘুম পাড়ানো যায়। এক কথা বার বার বললে শ্রোতার তন্দ্রার আবেশ হয়। আর আজ বেশির ভাগ বক্তারা যা করছেন সে হচ্ছে একই কথার অবিরাম পুনরাবৃত্তি। অবশ্য এঁরা বলবেন যে এঁরা যা বলছেন সে কথা নয়, মন্ত্র। তথাস্তু। তবে মানুষে মন্ত্রজপ করতে করতে নিজেও মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে পড়তে পারে। যোগনিদ্রাও নিদ্রা; অসাধ্য সাধন করবার যথার্থ উপায় জপ নয়, তপ।

সে যাই হোক, আমাদের জনগণকে পলিটিক্সের বিলেতি মদ অতি মাত্রায় পানকরানো নিশ্চয়ই নিরাপদ নয়। কারণ সে মদ তারা শোধন করে নিতে শেখেনি। ফলে যে সুরা পানকরে শিক্ষিত লোকের মনের অবস্থা হয় মদালস সেই সুরা পানকরে জনগণের মনের অবস্থা হয়ে উঠবে মদমত্ত। এবং তখন তাদের প্রলাপী নেশা দেখে আমাদের গোলাপী নেশা হয়ত ছুটে যাবে। তবে যুগধর্ম্ম কেউ অতিক্রম করতে পারে না, আমরাও পারব না। আমরা চাই আর না চাই কথার স্বরাজ্যের দিকে আমাদের progress করতেই হবে অর্থাৎ international হট্টগোলে আমাদের যোগ দিতেই হবে, তারপর যা থাকে কুল কপালে। এ ঐকতানে আমি যে যোগ দিতে নারাজ তার কারণ আমার স্বর আজ হয়ত লোকের কাণে একটু বেসুরা লাগবে। আমার এ বকুনি শুনে তোমার ধৈর্য্য বোধ হয় তুমি আর রক্ষা করতে পারছ না। আমি অন্তঃকর্ণে শুনতে পাচ্ছি যে তুমি বলছ যে, কথার বিরুদ্ধে কথা আমার মুখে শোভা পায় না; আমি নিজেই যখন বাক্যকায় বলে নিজের পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু এ ত আর নতুন কথা নয়। বাক্য-জগতের বাইরে বস্তু-জগতে বীরবলের যে কোনও অস্তিত্ব নেই, এ সত্য সর্ব্বপাঠক বিদিত। তবে নিজে সাফাই হবার জন্য এ কথা আমি বলতে বাধ্য যে বাক্য ও শব্দ এক বস্তু নয়। বাক্য মাত্রেই শব্দ কিন্তু শব্দ মাত্রেই বাক্য নয়। আমি এতদিন বাগ-বিন্যাস করে এসেছি এই বিশ্বাসে যে উক্ত উপায়ে আমি বঙ্গ-সরস্বতীর মন্দিরের দেয়াল গাঁথছিলুম কিন্তু যখন আবিষ্কার করলুম যে আমরা সবাই মিলে যে অভ্রভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়ে তুলছি সেটি হচ্ছে ভারতবর্ষীয়

Tower of Babel তখন হাত গোটাতে বাধ্য হলুম। এই হচ্ছে আমার নীরবতার কৈফিয়ত। যদি বলো-যে এতক্ষণ যা বকলুম তা আগাগোড়া নিরর্থক কথা তাহলে তোমার মতে আমিও সায় দেব। যে কথার অর্থ আছে তার যখন কোনও সামর্থ্য নেই তখন যে কথার অর্থ নেই, তার সামর্থ্য থাকতে পারে সেই ভরসায় এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা রচনা করলুম। ইতি—

বীরবল।

ফরাসি-কবি "বোদেলের"

—:※:—

স্বর্গের সৌন্দর্য্য অনেক কবি দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য যে কত কবি দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু নরকের সৌন্দর্য্য কয়জন দেখিয়াছেন বা দেখাইতে পারিয়াছেন? সুন্দরের সৌন্দর্য্য সকলেই অনুভব করিতে ও করাইতে চায়, কিন্তু কুৎসিতের সৌন্দর্য্যে কে বিমোহিত? আমি নরকের, কুৎসিতের শুধু চিত্রাঙ্কণ বা বিবরণের কথা বলিতেছি না—বীভৎস রসের উদাহরণ অপর্য্যাপ্ত না হইলেও বহু যে মিলে, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু শুধু এইটিকেই যিনি একান্ত করিয়া ধরিয়াছেন, এইটিকেই লইয়া যাঁহার সমস্ত কবিত্ব খেলিয়াছে এমন কবির কথা আমার জানা নাই। কুৎসিতের বীভৎসের নরকের ছবি যে কবি দিয়াছেন তিনি দিয়াছেন তাহা বৈচিত্রের জন্য, মুখ বদলাইবার জন্য, এক মুহূর্ত্ত দেখাইয়া আবার সুন্দরের দিকে সহজের দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য। কুৎসিতকে তিনি নিতান্ত কুৎসিত, বীভৎসকে নিতান্ত বীভৎসই দেখেন—কবি নিজেও তাঁহার অন্তরাত্মার পূর্ণ সহানুভূতি ইহাদের উপর ছড়াইয়া দিতে পারেন নাই। বর্জ্জন করিতে হইবে যাহা, এমন জিনিষটিই যেন তিনি দূর হইতে অঙ্গুলসিঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াছেন।

আমি বলিতেছি এমন লোকের কথা কুৎসিতকে কুৎসিত বলিয়া যে সুন্দর দেখে, নরককে নরক জানে বলিয়াই নরকের মধ্যে যাহার প্রাণের আনন্দ ও মুক্ত-বিলাস; প্রকৃতির সুশোভন দৃশ্য, সৌখীন-জনের মনোহারী ঐশ্বর্য্য, পুণ্যহৃদয়ের উচ্চবৃত্তি মহৎ করুণা প্রভৃতির দিকে যে তাকাইয়া দেখে নাই, যাহার ধ্যানে আসিয়াছে কেবল যেখানে যাহা কিছু অসুস্থকর অস্বস্তিকর, যাহার প্রেম উথলিয়া উঠিয়াছে হীনকে কদর্য্যকে উৎকটকে দেখিয়া দেখিয়া; মানুষের মধ্যে দেবভাবের, এমন কি অসুরভাবের কথা পর্য্যন্ত যিনি ভুলিতে বলিয়াছেন, যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন ব্যক্ত করিয়াছেন পিশাচে কি রকম আনন্দ পাইতে পারে, কি রস ভোগ করিয়া থাকে; জগৎকে মানুষকে যিনি দেখিয়াছেন শরীরের দিক হইতে, শুধু তাহাই নয়, যাঁহার লক্ষ্য হইতেছে এই শরীরের মধ্যে যাহা আবার যত ব্যাধিগ্রস্ত পূতিগন্ধময়, ন্যাক্কার-জনক।

শুনুন আমাদের কবি কি বলিতেছেন—

"এখানে সেখানে এক একটি করিয়া গৃহ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। নরনারী সব তাহাদের পাংশুবর্ণ চোখের পাতা মুদিয়া মুখ ব্যাদান করিয়া জড়পিণ্ডের মত ঘুমঘোরে অচেতন; ভিখারিনীদের বিশীর্ণ তুহিনশীতল স্তন ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বসিয়া বসিয়া তাহারা একবার আগুণে একবার নিজের আঙ্গুলের উপর ফুৎকার দিতেছে। ঠিক এই সময়েই হিমের মধ্যে, দৈন্যের মধ্যে গর্ভিনীর প্রসব বেদনা বাড়িয়া উঠিল; দূরে কুক্কুটের চীৎকার কুয়াসাময় আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে, যেন কোন আর্ত্তনাদ রক্তবমনের ফেণা ভেদ করিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে। কুজ্ঝটিকা-সাগরে প্রাসাদরাজি ডুবিয়া আছে।

আতুরাশ্রমের কোণে কোণে মুমূর্ষুদের হিক্কা-দিয়া নাভিশ্বাস উঠিয়াছে, লম্পটেরাও এখন কর্ম্মশ্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ঘরে ফিরিতেছে"। (১)

প্রাচ্য সাহিত্যে ইহার কিছু জুড়ি মিলে না, জগতের কোন প্রাচীন সাহিত্যেও এ রকম ভাব ভঙ্গিমা কোথাও পাই না। ভারতবাসীর প্রাণ এই রকম কথা এই রকম সুর শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াই যাইবে। কিন্তু কেবল ঐটুকু বলিয়াই আমাদের কবি নিশ্চিন্ত হন নাই। শুনুন কবির কথা—

"এক রাত্রিতে যখন আমি একটি ইহুদী রমণীর পাশে—শবের পাশে শবের মত—টান হইয়া শুইয়া ছিলাম—(২)

এ কি অসহ্য নয়? কিন্তু এটুকু ত সহ্য করিতেই হইবে; কানে আঙ্গুল দিবেন না, শুনুন আরও—

---

(1) Les maisons çа et la commençaient à fumer.
Les femmes de plaisir, la paupière livide,
Bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide;
Les pauvresses, trainant leurs seins maigres et froids,
Soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts.
C'etait l'heure où parmi le froid et la lésine
S'aggravent les douleurs des femmes en gésine;
Comme un sanglot coupé par un sang écumeux
Le chant de coq au loin dechirait l'air brumeux;
Une mer de brouillard baignait les édifices,
Et les agonisants dans les fond des hospices
Poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux.
Les debauchés rentraient, brisés par leurs travaux.

(2) Une nuit que j'étais prés d'une affreuse Juive,
Comme au long d'un cadavre un cadavre etendu—

Missing Page(s)

"জীবন থাকিতে তুমি তোমার এতখানি প্রেম দিয়াও যে পুরুষটিকে পরিতৃপ্ত করিতে পার নাই, সে কি তবে তোমার অসাড় অবশ মাংশ পিণ্ডের সহায়ে তাহার অপরিসীম বাসনা ভরাট করিয়া লইয়া সকল ক্ষোভ মিটাইল ?

"বল্ ওরে অস্পৃশ্য শব ! তোর রুক্ষ কেশরাশি ধরিয়া সে কি তোকে তাহার অস্থির বাহুপাশে তুলিয়া লইয়া ছিল ? বল্ দেখি ওরে বিকট দশনা ! তোর হিমদন্তপংক্তির উপর সে কি তবে তাহার শেষ বিদায়ের আদরগুলি আঁটিয়া দিয়া ছিল ?" (১)

আপনারা যাঁহারা পশ্চাত্য সাহিত্যের আধুনিক গতিবিধি কিছু জানেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রথমেই হয় ত বলিয়া উঠিবেন, এ কবিতাকে ত চিনি, এখানে 'জোলা' (Zola)—সম্প্রদায়ের স্থূল হস্তাবলেপ স্পষ্টই দেখিতেছি ; যদি কিছু পার্থক্য থাকে তবে বলিব ইহা জোলাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, এ যে ঘোর বস্তুতান্ত্রিকতা, প্রাকৃতবাদের চূড়ান্ত। ফলতঃ 'বোদেলের' যখন প্রথম সর্ব্বসাধারণের সহিত পরিচিত হইলেন তখন Realist ও Naturalist এর দল তাঁহাকে সাগ্রহে নিজেদেরই মধ্যে টানিয়া লইয়াছিলেন, এমন

(1) L' homme vindicatif que tu n'as pu, vivante,
Malgré tant d'amour, assouvir,
Combla—t-il sur ta chair inerte et complaisante
L' immensite' de son désir ?
Réponds, cadavre impur ! et par tes tresses roides
Te soulevant d'un bras fiévreux,
Dis-moi, tête effrayante, a t il sur tes dents froides
Collé les suprémes adieux ?

প্রতিভাসম্পন্ন শক্তিমান শিল্পীকে পাইয়া তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। বাস্তবিক যখন শুনি কবি বলিয়াছেন—

"ফাঁসিকাঠে একটা বাসি মড়া ঝুলিয়া রহিয়াছে—আর হিংস্র পাখীসব তাহাদের এই আহার্য্যের উপর চড়িয়া বসিয়া উৎকট উল্লাসে তাহাকে ছিঁড়িতেছে ফাড়িতেছে ; প্রত্যেকেই আপন আপন দূষিত চঞ্চু এক একখানি অস্ত্রের মত এই গলিত পদার্থটার রক্তমাখা কোণে কোণে বিঁধাইয়া দিতেছে।

"চক্ষু যেন তাহার দুটি গর্ত্ত—বিদীর্ণ উদর হইতে অন্ত্র সব খুলিয়া পড়িয়া উরুর উপরে বহিয়া চলিয়াছে ; বীভৎস তৃপ্তিতে ভরপূর সে নারকীয় জীবেরা চঞ্চুর আঘাতে আঘাতে তাহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।" (১)

তখন ইহাকে আবরুপর্দ্দাহীন নির্লজ্জ বস্তু-তান্ত্রিকতা ছাড়া আর কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয় কি ?

কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া শুনুন আরও একটু—ইতি মধ্যেই করিব কথার মধ্যে অভিনব কিছুর ইঙ্গিত যদি না পাইয়া থাকেন, তবে কবিকে তাঁহার বক্তব্যটি শেষ করিতে দিন। ফাঁসিকাঠ, গলিত সব, শকুনি

(1) Des féroces oiseaux perchés sur leur pâture
Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr,
Chacun plantant, comme un outil, son bec impur
Dans tous les coins saignants de cette pourriture ;
Les yeux étaient deux trous, et du ventre effondré
Les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses,
Et les bourreaux, gorgés de hideuses délices,
L'avaient à coups de bec absolument châtré.

গৃধিনী—এ সকলের কথা কবি বলিতেছেন; কিন্তু এ সব কি, কোন্ রহস্য ইহারা মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিতেছে? কবির দৃষ্টি যে সেইখানে। শুনুন—

"প্রেম যে দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেই দেশে তোমার বসবাস, আকাশ যে দেশের এমন স্বচ্ছ সুন্দর সেইখানে জন্ম তোমার। তোমার ব্রত অনুষ্ঠান লোকের কাছে হেয়, নানা পাপের জন্য তোমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটি পর্য্যন্ত হইতে তুমি বঞ্চিত; সেই সকলের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই এই তুমি নিঃশব্দে এত অপমান সহ্য করিতেছ!" (১)

একি নূতন কথা, নূতন সুর! বস্তুতান্ত্রিকতা প্রাকৃতবাদ সব এখানে কি আস্তে আস্তে গলিয়া যাইতেছে না? শুনুন তবে শেষ পর্য্যন্ত—

"তুচ্ছ পদার্থ তুমি, তোমাকে দেখিয়া হাসি পায়, কিন্তু তোমার দুঃখ যে আমারই দুঃখ। তোমার অঙ্গ সব বাতাসে দুলিতেছে, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমার বোধ হইতেছে কি যেন একটা অতি পুরাতন বেদনার সুদীর্ঘ বিষাক্ত নদ বমির মত আমার তালু পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতেছে।

"হায় রে অভাগা, কত মহার্ঘ স্মৃতি তোমার সাথে জড়িত! তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমিও অনুভব করিয়াছি সেই যত সব হিংস্র বায়সের করাল চঞ্চুস্পর্শ, কৃষ্ণকায় শ্বাপদের বিকট

(১) Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si beau,
Silencieusement tu souffrais ces insultes
En expiation de tes infâmes cultes
Et des péchés qui t'ont interdit le tombeau.

দন্তাঘাত—এক সময়ে যাহারা আমার মাংসপিণ্ডকে বিধ্বস্ত করিয়া এত আনন্দ পাইত।

*** *** *** "

"ওগো প্রেমের দেবতা! তোমার রাজ্যে আমি শুধুই দেখিতে পাইয়াছি ফাঁসিকাঠের একটা প্রতিমা আর তাহাতে ঝুলিয়া আছে আমারই ছায়াটি……হা ভগবান, আমাকে শক্তি দাও, সাহস দাও, যেন নিজের হৃদয় নিজের দেহের প্রতি চাহিয়া দেখিতে আমার ঘৃণা না হয়!" (১)

এ ত মোটেই 'জোলা'-সম্প্রদায়ের মত কথা নয়! ফলতঃ "বোদেলের" আর বস্তুতান্ত্রিকের মধ্যে আছে আকাশ পাতাল প্রভেদ। উভয়ের উপকরণ মালমশলা একই রকম হইতে পারে, কিন্তু দুইজনে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন দুই ভাবে-ভঙ্গিমায়। বস্তুতান্ত্রিক বা প্রাকৃতবাদী জগতের মানুষের স্থূলতম দিকটাই শুধু

(১) Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes!
Je sentis, à l'aspect de tes membres flottants,
Comme un vomissement, remonter vers mes dents
Le long fleuve de fiel des douleurs enciennes.
Devant toi, pauvre diable au sonvenir si cher,
J'ai senti les becs et toutes les mâchoires
Des corbeanx lancinants et des panthères noires
Qui jadis aimaient tant à torturer ma chair.
*** *** ***

Dons ton île, ô venus! je n'ai trouvé debout
Qu'un gibet symbolique où pendait mon image——
—Ah! Seigneur! donnez moi la force et le courage
De contempler mon cœur et mon corps sans degoût!

দেখিয়াছেন, কদর্য্য কুৎসিত রোগগ্রস্ত যাহা তাহার ফটোখানি তুলিয়া লইয়াছেন মাত্র, তিনি এ সকলের অন্তরে প্রবেশ করেন নাই, ইহাদের মধ্যে কিছু গুপ্তবার্ত্তা বা রহস্য খুঁজিয়া পান নাই। বোদেলের এ সকল দেখিয়াছেন, এ সকলের চিত্র দিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের ভিতরের একটা নিগূঢ় সত্যের ও সৌন্দর্য্যের প্রতীকরূপে; স্থূলকে একটা সূক্ষ্মের মধ্যে, বস্তুকে একটা ভাবের মধ্যে, অল্পকে ক্ষুদ্রকে একটা ভূমার অনন্তের মধ্যে উঠাইয়া ধরিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তন, এই রূপান্তরই খাঁটি কবিতার মূল কথা, ইহা ছাড়া কাব্যরস নাই, থাকিতে পারে না। বস্তুতান্ত্রিকগণ এই রূপান্তরের তোয়াক্কা রাখিতেন না, ইহার কোন প্রয়োজন অনুভবই করিতেন না। বোদেলের কিন্তু গোড়ায় পাইয়াছিলেন ঐ লোকান্তরের ভাবজগতের একটা বিশেষ উপলব্ধি, এবং উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সাজাইয়া ধরিয়াছিলেন ঐ নিগূঢ় উপলব্ধিটিকে ফুটাইয়া ফলাইয়া তুলিবার জন্য। ঠিক এই জন্যেই দেখিতে পাই, উপকরণ চয়নেও বস্তুতান্ত্রিক ইহাতে তাঁহার বিশেষ পার্থক্য আছে। বস্তুতান্ত্রিকগণ স্থূল কদর্য্য জিনিষ সব সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত বটে, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে খুব সাধারণ সহজ সুলভ জিনিষের উপর, যাহা সকলেই সর্ব্বত্র দেখে শুনে জানে। বোদেলের কিন্তু তাহা করেন নাই; কুৎসিত বীভৎস ন্যাক্কারজনক জিনিষের মধ্যে যাহা আবার অতি কুৎসিত বীভৎস ন্যাক্কারজনক, যাহা সচরাচর যেন নজরে পড়ে না, পরিচিত হইলেও যাহা লোকে দেখে না বা দেখিতে চায় না, তিনি সেই সমস্তই খুঁজিয়া পাতিয়া বহির করিয়াছেন, এমন কি বস্তুজগতে যাহার সন্ধান পান নাই, কল্পনা লোক হইতে তাহাকে গড়িয়া লইয়াছেন। কারণ তিনি

ত যেমন তেমন রূপ চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছেন এমন রূপ যাহা তাঁহার বিশেষ ভাবটির প্রকাশ বা অভিব্যঞ্জনা significant forms—এই form রূপ আশ্রয় মাত্র; তাঁহার লক্ষ্য ভিতরের significance অর্থ, ব্যঞ্জনা, একটা নিগূঢ় রস। তাই দেখি তিনি যখন বিকট উৎকট বীভৎস জিনিষের চিত্র দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এমন আলোছায়া খেলাইয়া তুলিয়াছেন, এমন একটা বর্ণগন্ধ মিশাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে এমন একটা ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে সে জিনিষটি আর ঠিক সে জিনিষ বলিয়া মনে হয় না, যেন আর একটা লোক হইতে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও গরিমা লইয়া, কি চিরন্তন সত্য লইয়া দেখা দিয়াছে; সে আর Realist-দের la verité vraie, লব্ধ বাস্তব বস্তু নয় তাহা হইতেছে একটা দৃষ্টি, Revelation.

কবি ফাঁসি কাষ্ঠে দোদুল্যমান যে পলিতশবের বীভৎস চিত্র রক্তবর্ণের—না মরণের পাংশুটে ফ্যাকাসে রঙে আঁকিয়া দিয়াছেন, সে কি তিনি একান্ত বাস্তব পার্থিব লোক হইতেই তুলিয়া ধরিয়াছেন? না। কবি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতেছে—

"একটা রূপক ফাঁসিকাষ্ঠ আর তাহাতে ঝুলিয়া আমারই প্রতিমূর্ত্তি"। বস্তুত আমাদের কবির দিব্যদৃষ্টিতে এই সত্যটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে বিশ্বসৃষ্টি হইতেছে একটা বিরাট ফাঁসিকাষ্ঠ, তুমি আমি বিশ্বের সকল জীব তাহাতে ঝুলিয়া আছি। কবি জগতের সেই দিকটাই উপলব্ধি করিয়াছেন যে দিকে তাকাইলে আমরা দেখি আছে সেখানে একটা বিরাট নির্য্যাতনের যন্ত্র, বিশ্বের সামগ্রী যেখানে দলিত পিষ্ট হইতেছে। অথবা ভারতীয় রূপকে আমরা বলিতে পারি সৃষ্টি হইতেছে একটা

বিরাট বিকট যজ্ঞ, সেখানে মনোরম মোলায়েম বলিয়া কিছু নাই, জীব সেখানে বলি মাত্র—

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাদ্
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

শিবকে মানিতে হয় মানিতে পার, কিন্তু রুদ্রই হইতেছে জাগ্রত দেবতা—জগৎ হইতেছে শ্মশান কালীর লীলা-ভূমি।

ভগবান সত্য হইতে পারে, কিন্তু রুদ্রই হইতেছে শয়তান। তুমি শয়তানকেও ভগবানেরই মূর্ত্তি বলিয়া ধরিতে পার, কিন্তু শয়তান শয়তানই। দেখ চারিদিকে, দেখ নিজের ভিতরে তাকাইয়া, দেখ সহজ দৃষ্টি দিয়া, অকুণ্ঠিত চিত্ত লইয়া, কিছু লুকাইতে, ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিও না। তবুও যদি বল তুমি শয়তানকে দেখিতে পাইতেছ না, তবে বলিব তুমি স্বেচ্ছাকৃত অন্ধ, তুমি ঘোর মিথ্যাচারী, কাপুরুষ। আমি ত স্পষ্টই দেখিতেছি—

"আমরা পুতুলের মত নড়িতেছি চড়িতেছি আর শয়তানেই ধরিয়া আছে তার কলকাঠি! বীভৎস জিনিষেই আমাদের পরম তৃপ্তি। কোন ঘৃণাভয় নাই প্রতি দিবসে এক পা এক পা করিয়া আমরা পূতিগন্ধময় অন্ধকারের ভিতর দিয়া ক্রমাগত নরকের অভিমুখে নামিয়া চলিয়াছি!" (১)

(১) C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent!
Aux objets repugnats nous trouvons des appas;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas
Sans horreur, à travers des ténèbres qni puent.

প্রকৃতির বুকে কুয়াসা কুজ্ঝটিকা অন্ধকার ঝড়বৃষ্টি জলকাদা বৃষ্টি পচা আবর্জ্জনা দূষিত পূতিগন্ধময় হাওয়া নাই? কৃমি কীট বিকট সরিসৃপ ভূত প্রেত বিভীষিকা নাই? মানুষের মধ্যে রোগ নাই জরা দৈন্য নাই মৃত্যু নাই? চিন্তা নাই, হতাশা নাই, শোক নাই, বেদনা নাই, যন্ত্রনা নাই? অনাচার অত্যাচার উচ্ছৃঙ্খলতা—এ সব কি? কাম ক্রোধ লোভ মোহ, এসব কি? অধর্ম্ম, পাপ, পতন, অমঙ্গল সহস্র রকম মোহের মধ্যে মানুষ ভিতরে বহিরে ডুবিয়া নাই কি?

আমি ত দেখছি, মানুষ হইতেছে—

"অভিশপ্ত জীব, কোন আলো না লইয়া সে একটা গভীর গহ্বরের মুখে নামিয়া যাইতেছে; গন্ধেই পরিচয় দিতেছে সে গহ্বরের সিক্ত অতল, আর তার অবলম্বনহীন অনন্ত সোপানাবলী।

"সেখানে জাগে তৈলাক্তদেহ বিকটাকার জানোয়ার সব; তাদের প্রস্ফুরকদীপ্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চক্ষু, সেখানের এক টানা রাত্রিকে আরও অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে; সে চক্ষু ছাড়া আর কিছু সেখানে দৃষ্টিগোচর হয় না।" (১)

শুধু তাই নয়, আরও এক কথা—দুঃখের ক্ষোভের কি না জানি না—তাহা হইতেছে এই যে, পৃথিবী নরকের তুল্য, মানুষ শয়তানের

(১) Un damné descendant sans lampe
Au bord d'un gouffre dont l'odeur
Trahit l'humide profondeur,
D'eternels escaliers sans rampe,
Où veillent des monstres visqueux
Dont les larges yeux de phosphore
Font une nuit plus noire encore
Et ne rendent visibles qu'eux!

আত্মজ, নিজেরই ইচ্ছায়, আনন্দেরই টানে। কুৎসিত হইতেই মানুষের ভাল লাগে, কুকর্ম্মেই তাহার বিলাস; কি একটা তুষ্টি তৃপ্তিই সে পাইতেছে তাহার দুঃখে, কষ্টে, অভাবে, অতৃপ্তিতে—তাহার জীর্ণ আবাসে, জীর্ণ দেহে, জীর্ণ মনে প্রাণে—তাহার সকল পাপ সকল কলুষতার মধ্যে। ভক্ত এ সকলকে ভগবানেরই লীলা বলিবেন, কিন্তু আমি দেখিতেছি—

"আমার যে সুবিস্তৃত রাত্রির পট, তাহার উপর যে ভগবান নিপুণ হস্তে কেবলই একটা বিচিত্র দুঃস্বপ্ন অবিশ্রান্ত আঁকিয়া চলিয়াছেন।" (১)

কেন এমন হইল? সেই চিরন্তন প্রশ্ন অমঙ্গল আসিল কেন, কোথা হইতে? সেই যে দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা, তাহার উত্তর কি? মানুষ যে নরক চায় না, তাহা নয়; তাহা হইলে নরক আসিতেই পারিত না। নরককে চাই না, অথচ চাই—এ কি রহস্য, কি প্রহেলিকা?

আকাশের তারা ভূতলের কাদায় আসিয়া ডুবিল কেন? স্বর্গের যে অধিবাসী সে নরকের মধ্যে দিয়া ছুটিয়া পড়িল কেন? 'কেন' বোধ হয় নাই, এ যে

"একটা নিয়তির অমোঘ বিধান—ইহাতে প্রমাণিত হয় এই শুধু, যে শয়তানে যাহা করে তাহা সে ভাল করিয়াই করে।" (২)

ভাললাগার কারণ, ভাল লাগা, প্রাণের টান, যাহার হৃদয় যেখানে মজে। তুমি ভালবাস পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, আমি ভালবাসি ঘোর

(১) Sur le fond de mes nuits Dieu de son doigt savant
Dessine un cauchemar multiforme et sans trêve!

(২) Une fortune irrémédiable,
Qui donne à penser que le Diable
Fait toujours bien tout ce qu'il fait!

অমানিশা। তুমি ভালবাস প্রমোদ উদ্যান, আমি ভালবাসি শ্মশান। তুমি ভালবাস কোমল মৃদুল মনোরম যাহা, আমি ভালবাসি কঠিন উগ্র তীব্র বিকট যাহা। ইহা কেবল রুচিভেদের কথা ছাড়া আর কি? পৃথিবীতে আছে দুই রকম সৌন্দর্য্য, দুই রকম সৌরভ—

"এক, এমন যাহা শিশুর দেহের মত তাজা, বাঁশীর সুরের মত মধুর ভরা ক্ষেতের মত সবুজ,

"আর এক রকম যাহা হইতেছে গলিত উগ্র বিশ্ববিজয়ী—যাহার মধ্যে প্রসারিত রহিয়াছে অসীমের বিস্তৃতি।" (১)

কিন্তু আমার কথা যদি ধর তবে -

"অতল গহ্বরের মত গভীর এই প্রাণ চায় তোমাকে, ওগো মাকবেথ-পত্নী, চায় তোমার সেই পাপসমর্থ প্রাণকে, চায় কবি এস অখিলের সেই স্বপ্নকে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে কুজ্ঝটিকার ঝড় ঝাপটার আকাশে।

অথবা সে চায় তোমাকে, মাইকেল এঞ্জেলর মানসতনয়া, ওগো ঘোরা রজনী! চায় তুমি যখন তোমার আহার্য্যসম্ভার রাক্ষসের গ্রাসে অতি প্রশান্তচিত্তে চিবাইতে থাকি তখনকার সেই অদ্ভুত ঠাম।" (২)

(১) Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants,
Doux comme le hautbois, verts comme les prairies,
—— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants,
Ayant l'expansion des choses infinies—

(২) Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abime,
C'est vous, lady Macbeth, âme puissante en crime,
Rêve d'Eschyle éclos au climat des antans;
Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel Ange,
Qui tors paisiblement dans une pose étrange
Tes appas façonnés aux bouches des titans!

তুমি বলিবে এ সব উৎকট রুচি, বিকৃত স্বভাবের কথা। ইহা আমার পক্ষেও স্বাভাবিক নয়, এ সব জোর করা জিনিষ, অভিনয় মাত্র। কিন্তু না, মোটেই তাহা নয়—বীভৎস বিকট আমার ভাল লাগে সত্যই তাই তাহাকে ভালবাসি; ভালবাসি অর্থ তাহাকে আমি সুন্দর দেখি। আমার অন্তরাত্মা সৌন্দর্য্যকেই খুঁজিতেছে, তাই যেখানে সে সৌন্দর্য্য পাইব সেখান হইতেই তাহাকে কুড়াইয়া লইব। সৌন্দর্য্যের উৎস যেখানেই হউক না কেন—সে যদি এমন সৌন্দর্য্য হয় যে আমার মন প্রাণকে মাতাইয়া চেতাইয়া উধাও করিয়া দেয়—তবেই হইল, আর কিছু চাই না। দেখুন, কুৎসিতের কবি কি রকমে একনিষ্ঠ সৌন্দর্য্যের কবি হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মবোধ নীতিবোধ শালীনতা শোভনতাবোধ কোন বাঁধনের মধ্যেই তিনি ধরা দিতেছেন না। বিল্বমঙ্গল প্রেমের টানে পচা মড়াকে আশ্রয় করিয়া, বিষাক্ত সাপকে ধরিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের কাছে ছুটিয়াছিলেন। আমাদের কবিও বলিতেছেন, আমি তোমার কান্ত কঠোর, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, আরাম যন্ত্রণা শ্রেয় প্রেয়, দূষিত পূত—কিছু গণনা করি না। ও সব অবান্তর জিনিষ আমি বুঝিতে চাই না—আমি বুঝি সুন্দর। আমি এই সুন্দরকেই, এই রসময়কেই উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাকেই আমি আহ্বান করিতেছি—

"তুমি স্বর্গ হইতেই আসিয়া থাক আর নরক হইতেই আসিয়া থাক, কি আসে যায়, ওগো সুন্দর! ওগো বিকট ভীষণ সরল! তোমার দৃষ্টি, তোমার হাস্য, তোমার লাস্য আমার সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছে একটা অসীমের তোরণ। সেই অসীমেরই প্রেমে আমি পাগল; হায়, তাহার সহিত আমার কোন দিন যে পরিচয় হইল না।

দানবের হউক আর দেবতার হউক, কি আসে যায়? দেবী হও আর মায়াবিনী হও কি আসে যায় যদি তুমি—ওগো পেলব-নয়না পরীটী, ওগো মূর্চ্ছনা, ওগো সৌরভ, ওগো জ্যোতি, ওগো আমার একমাত্র হৃদয়রাণী—যদি তুমি এই বিশ্বের কদর্য্যতা একটু উপশম করিতে পার, যদি তুমি সময়ের গুরুভার কিছু লাঘব করিতে পার!" (১)

আমাদের কবি কোথা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে কোথায় চলিয়াছেন মোটা তারের ঝঙ্কারের মধ্য হইতে সরু তারের কি একটা সূক্ষ্ম সুর স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতেছেন কি? বস্তুতন্ত্রতাকে কোথায় আমরা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি। এখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি, Realistদিগের ন্যায় বোদেলের শুধুই এ জগতের অধিবাসী নহেন। সহজ সুলভ সাধারণ ভাসা ভাসা যাহা, স্থূল ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই যাহার পরিসমাপ্তি, সেখানে কি রস কি রহস্য আছে—যদি তাহার মধ্যে অসাধারণ অতীন্দ্রিয়কে না পাইলাম? সেখানে যে সবই জানা চেনা সামান্য অল্প সঙ্কীর্ণ। যাহা সুন্দর যাহা রসময় তাহা আমার পক্ষে অজানা অচেনা হওয়া চাই, তাহাকে অসীমের সাথে অনন্তের সাথে মিশিয়া মিলিয়া যাইতে হইবে—

(১) Que tu viennes du ciel ou de l'enfer, qu'importe,
O Beauté! monstre énorme, effrayant, ingenu!
Si ton oeil, ton souris, ton pied, m'ouvre la porte
D'un Iufini que j'aime et n'ai jamais connu?
De Satan ou de Dieu, qu'importe? Ange on Sirène,
Qu'importe, si tu rends,—fée aux yeux de velours,
Rhythme, parfum, lueur, ô mon unique reine!—
L'univers moins hideux et les instants moins lourds?

"কোন দিন যাহাকে দেখি নাই, সেই অসীমকেই যে আমি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।"

কবি তাই খুঁজিয়াছেন আর এক জগৎ, তিনি যেন আপনার দেশ ছাড়িয়া এই পরদেশে আসিয়া পড়িয়াছেন, ঘরের জন্য বুঝি তাই তাঁহার প্রাণ গুমরিয়া গুমরিয়া ফোঁপাইয়া উঠিতেছে, আর একজন আর এক রকমের ঘর-হারা কবির কথায়—

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে! (গীতাঞ্জলি)

কোথায় এই আর এক জগৎ, এই স্বদেশ, এই আপনার ঘর? সে জন্য আমাদের দৃষ্টি সহজেই উপরের দিকে ধায়, কবিরা সব তাহাই করিয়াছেন। বোদেলের কিন্তু তাহা করেন নাই, পারেন নাই। এই জগতের সাথেই তাঁহার নাড়ীর টান—এই জগতের মধ্যে, ধূলা মাটির অন্তরালেই তাঁহার জগৎ তিনি খুঁজিতেছেন। এ জগৎকে ছাড়িয়া ভুলিয়া তিনি যাইতে পারেন নাই—তিনি যে "নিজবাসভূমে পরবাসী"। বোদেলের তাঁহার দৃষ্টি দিয়াছেন উপরের দূরের পানে নয়—কিন্তু নীচের দিকে, অতি কাছে। দূরই কি কেবল দূরে—কাছের মত দূর কি আছে? আমাদের কবি আকাশের দিকে না উঠিয়া, নামিয়াছেন মাটির দিকে, স্বর্গের অভিমুখে না যাইয়া তিনি চলিয়াছেন নরকের অভিমুখে, দেবতার সাহায্য না চাহিয়া তিনি চাহিয়াছেন যক্ষরক্ষ নাগ দানা পিশাচের সাহচর্য্য। আশ্চর্য্যের কথা,

সেখানেই তিনি পাইয়াছেন তাঁহার সেই প্রিয়, সেই অসীম, সেই প্রাণ মন মাতান সৌন্দর্য্য সুষমা সৌরভ—সেই

"সীমাহীনের সুবিস্তৃত আকাশ যেখানে দেহ মন আপনাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, মুক্তির গানে মুখরিত হইতেছে।" (১)

বাস্তবিক, কুৎসিত বিকট বীভৎস নারকীয় পদার্থকে বোদেলের কি যাদুমন্ত্রে যে রূপান্তরিত করিয়া ধরিয়াছেন, কি মোহন স্পর্শে এ সকলের মধ্য হইতে একটা পরম সৌন্দর্য্য নিবিড় রস অতীন্দ্রিয় সত্যকেই প্রকটিত করিয়াছেন তাহা দেখিবার জিনিষ। মূত্রপুরীষের মধ্যে শূকরের আনন্দ—বলিবে, ইহা বিস্ময়ের কি? কিন্তু শূকর মূত্রপুরীষকে মূত্রপুরীষ বলিয়া বোধ করে না, ইহার মধ্য হইতে দিব্য গন্ধ দিব্য আস্বাদনও কিছু লাভ করে না—এই রূপান্তর সম্ভব এক যোগীর মধ্যে, আর না হয় কবির মধ্যে। মূত্রপুরীষের মধ্যে নন্দনের হাওয়া কবি কিরূপে বহাইয়া দিয়াছেন, দেখুন তাহার একটি নমুনা—কবিতাটি দীর্ঘ হইলেও, ইহার মধ্যে বোদেলেরের প্রতিভা এমন ফুটিয়া উঠিয়াছে যে পাঠকগণকে জোর করিয়া শুনাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

কবি দিতেছেন বালিকা থাকিতেই যাহারা বুড়ী হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের চিত্র—

"অতি পুরাতন নগরীর আঁকাবাঁকা অলিগলিতে সব জিনিষ এমন কি বিভীষিকা পর্য্যন্ত কুহকে মণ্ডিত হইয়া দেখা দেয়; সেই

(১) ——L'expansion des choses infinies
••• ••• •••
Qui chantent les transports de l'esprit et de sens.

সব জায়গাতেই আমি প্রাণের একটা অদম্য টানে ছুটিয়া যাই আর চুপি চুপি দেখি যত অদ্ভুত শীর্ণ জীর্ণ অথচ কি মনোহর জীব সব!

এই সব ভগ্ন চূর্ণ বিকটাকার প্রাণী এককালে রমণী ছিল—কাহারও নাম হয়ত এপোনীন, কাহারও বা লাইস! কুব্জপৃষ্ঠ, ম্যুজদেহ, অষ্টাবক্র—বিকট প্রাণী ইহারা, হোক্ না, এস ইহাদিগকে আমরা ভালবাসিব। আহা! শতছিদ্র আবরণের অন্তরালে হিমজড় খোলসের নীচে, তবুও যে একটি জীব এখানে জাগিয়া আছে!

নিষ্ঠুর হাওয়ায় ঘা খাইতে খাইতে, গাড়ির ঘর্ঘরে কাঁপিতে কাঁপিতে, বুকের মধ্যে কি একটা ফুল তোলা অথবা ছাইপাঁশ কিছু দিয়ে গাঁথা থলিয়া স্মৃতি চিহ্নের মত জোরে আঁটিয়া ধরিয়া, ইহারা হামু দিয়া চলিয়াছে!" (১)

"কেহ টিক্ টিক্ করিয়া চলিয়াছে, ঠিক যেন কাঠের পুতুলটি! কেহ বা আহত পশুর মত আপনাকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইতেছে! কেহ বা নাচিতে না চাহিয়াও নাচিতেছে—আহা! এ যেন ঘণ্টার

(১) Dans les plis sinueux des vieilles capitales,
Où tout, même horreur, tourne aux enchantements,
Je guette, obéissant à mes humeurs fatales,
Des êtres singuliers, décrepits et charmants
Ces monstres disloqués furent jadis des femmes,
Eponine ou Laïs! — Monstres bridés, bossus
Ou tordus, aimons les! Ce sont encor des âmes
Sous des jupons troués et sous des froids tissus.
Ils rampent, flagellés par les bises iniques,
Frémissant au fracas roulant des omnibus,
Et serrant sur leur flanc, ainsi que des réliques,
Un petit sac brodé des fleurs ou de rébus;

মধ্যে দোলকের মত একটা দৈত্য নির্দ্দয়ভাবে ফাঁসীতে ঝুলিয়া মরিতেছে!

"দেহ যে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে তবুও দেখ, চোখ ইহাদের শূলের মত তীক্ষ্ণ, রাত্রিকালে সুপ্তসলিলপূর্ণ গর্ত্তের মত উজ্জ্বল। আবার আলো দেখিলেই ছোট্ট মেয়েটি যেমন আশ্চর্য্য হইয়া পড়ে, হাসিয়া কুটি কুটি হয়, তেমনি ইহাদের চাহুনিতে মাখা আছে কি একটা শিশুসুলভ সরল দিব্য ভাব।

"তোমার নজরে পড়িয়াছে কি, কত কত বৃদ্ধার শবাধার শিশুর শবাধারের মতই ছোট। এই একই ধরণের দুইটি শবাধার তৈয়ারী করিয়া শিল্পী-শ্রেষ্ঠ মরণ কি অদ্ভুত কি মনোহর রুচির পরিচয় দিতেছে, কি একটা কথা ইঙ্গিতে জানাইতেছে। (১)

(১) Ils trottent, tout pareils à des marionettes;
Se trainent, comme font les animaux blessés,
Ou dansent, sans vouloir danser, pauvres sonnettes
Ou se pend un Démon sans pitié! Tout cassés
Quils sont, ils ont des yeux percant comme une vrille,
Luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit;
Ils ont des yeux divins de la petite fille
Qui s'étonne et qui rit ä tout ce qui reluit.
— Avez-vous observé que maints cerceuils de vieilles
Sont presque aussi petits que celui d'un enfant?
La Mort savante met dans ces bières pareilles
Un symbole d'un goût bizarre et captivant,
Et lorsque j'entrevois un fantôme débile
Traversant de Paris le fourmillant tableau,
Il me semble tonjours que cet être fragile
S'en va tout doucement vers un nouveau berceau
*** *** ***

আমি যখন চাহিয়া দেখি পারী নগরীর গহন জনতা ভেদ করিয়া এই রকম একটি জীর্ণ ছায়ামূর্ত্তি চলিয়াছে, তখনই আমার মনে হয় এই ক্ষীণপ্রাণ জীবটি যেন ধীরে ধীরে চলিয়াছে আর এক মাতৃকোলের দিকে।

"এই সব চক্ষু কোটি অশ্রুবিন্দু দিয়ে গড়া এক একটি কূপ অথবা কোন গলিত ধাতু হইতে ঢালাই করা এক একটি কটাহ··· এই সব চক্ষুতে তবু আছে কি নিবিড় রহস্য কি অজেয় আকর্ষণ তাহা জানে সেই অভাগা যে একটা নির্ম্মম দুষ্টগ্রহের স্তন্যেই কেবল বাড়িয়া উঠিয়াছে।

"ইহারা সকলেই আমার মনকে মাতাল করিয়া ফেলে; কিন্তু এই সব ক্ষীণপ্রাণ জীবদের মধ্যেই এমনও আবার কেহ কেহ আছে যাহারা বেদনাকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে, যাহারা এক নিষ্ঠার পাথায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছে, 'হে পরাক্রমী দৈত্য, তুমি আমাকে স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দাও'।

"একজন তাহার দেশের জন্য বিপদে বিপদে শানিয়া উঠিয়াছে, ঐ আর একজনকে তাহার পতি যন্ত্রনায় যন্ত্রনায় পিষিয়া দিয়াছে, ঐ আরও একজন তাহার সন্তানের জন্য জীর্ণ বুক লইয়া মূর্ত্তিমান মাতৃস্বরূপে দাঁড়াইয়াছে—আহা! ইহারা প্রত্যেকেই চোখের জলে এক একটা নদী বহাইয়া দিতে পারে।

"আহা, আমি এই রকম কতই না বালবৃদ্ধাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি।

"ঐ একজন এখনও সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া—গর্ব্বে ঋতুর উত্তেজনায় সে বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে, ঐ রুদ্র দীপক রাগিনী বুভুক্ষিতের

মত আঘ্রাণ করিতেছে; তাহার চক্ষু সময়ে সময়ে বৃদ্ধ ঈগলপাখীর চক্ষুর মত উন্মীলিত হইতেছে। বিজয় মুকুটের উপযুক্ত করিয়াই তাহার কপালটি যেন মর্ম্মর পাথরে গঠিত হইয়াছে। (১)

"এইরূপে তোমরা রূপসী সব, কোন অনুযোগ না করিয়া, সকল সহিয়া সহিয়া, সংক্ষুব্ধ নগরীর ঘূর্ণীপাকের ভিতর দিয়া চলিয়াছ; তোমাদের কাহারও মায়ের বুক ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে, কেহ বা তোমাদের রূপের পসারিনী, কেহ বা পরম পূণ্যবতী—আহা, তোমাদের নাম যে এককালে সকলের মুখে মুখে ফিরিত।

"ওগো শুষ্ক ছায়ামূর্ত্তি সব, বাঁচিয়া থাকিতেও তোমাদের লজ্জা হইতেছে, তাই বুঝি ভয়ে ভয়ে হাম্ দিয়া দেয়ালের পাশ ঘেঁষিয়া

(১) Ces yeux sont des puits faits d'un million de larmes,
Des creusets qu' un metal refroidi pailleta – – –
Ces yeux mystérieux ont d'invincibles charmes
Pour celui que l'austère Infortune allaita !
*** *** ***
Toutes m'enivrent ! mais parmi ces êt resfrêles
Il en qui, faisant de la douleur un miel
Ont dit au Devouement qui leur prêtait ses ailes :
" Hippogriffe puissant, mène-moi jusqu'au ciel !"
L'une, pour sa patrie au malheur exercée,
L'autre que son époux surchargea de douleurs,
L'autre pour son enfant Madonne transpercée,
Toutes auraient pu faire un fleuve avec leurs pleurs !
Ah ! que j'en ai suivi de ces petites vieilles !—
*** *** ***
Celle-là droite encor, fière et sentant la règle
Humait avidement ce chant vif et guerrier ;
Son œil parfois s'ouvrait comme l'œil d'un vieil aigle ;
Son front de marbre avait l'air fait pour le laurier !

চলিয়াছ—হায় রে বিচিত্র ভাগ্য লেখা সব। কেহ তোমাদের অভিবাদন করে না, তোমরা যে মানবজাতির আবর্জ্জনা, তোমরা যে অনন্তের কবলে আসিয়া পড়িতেছ।

"কিন্তু আমি, আমি ত দূর হইতে তোমাদিগকে পরম স্নেহভরে চোখে চোখে রাখিয়াছি; দৃষ্টি আমার আশঙ্কায় ভরা, তোমাদের পতনোন্মুখ পদবিক্ষেপের উপর সর্ব্বদা নিবদ্ধ—আমি যেন ঠিক তোমাদের পিতা। কি আশ্চর্য্য! তোমাদের অজানিতেই কি একটা গোপন তৃপ্তি তোমরা আমায় দিতেছ! (১)

"আমি যেন দেখিতেছি তোমাদের সেই প্রথম প্রণয়-আবেগ সব প্রস্ফুটিত হইতেছে; দুর্দ্দিন হউক আর সুদিন হউক, তোমাদের সেই যত হারান দিনের মধ্য দিয়াই আমি চলিয়াছি। আমার হৃদয় শতগুণ হইয়া তোমাদের সকল পাপের আনন্দ উপভোগ করিতেছে, আমার অন্তরাত্মা তোমাদের সকল পুণ্যের অলোক পাইয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে!

(১) Telles vous cheminez, stoïques et sans plaintes,
A travers le chaos des vivantes cités,
Mère au cœur saignant, courtisanes ou saintes,
Dont autrefois les noms par tous étaient cités.

*** *** ***

Honteuses d'exister ombres ratatinées,
Peureuses, le dos bas, vous côtoyez les murs;
Et nul ne vous salue, étranges destinées!
Débris d'humanité pour éternité mûrs!
Mais moi, moi qui de loin tendrement vous surveille
L'œil inquiet fixé sur vos pas incertains,
Tout comme si j'étais votre père, ô merveille!
Je goûte à votre insu des plaisirs clandestins!

ওগো ভগ্ন চূর্ণ অবশেষ সব! তোমরাই যে আমার আত্মীয় স্বজন; যে রক্তে তোমাদের জন্ম, সেই রক্তেই আমারও এ দেহ পিণ্ডের জন্ম! প্রতি সন্ধ্যাতেই আমার বিদায় সম্ভাষণ তোমাদিগকে নিবেদন করিতেছি। ওগো অশীতিপর বৃদ্ধা নবীন জননী সব, কাল তোমরা কোথায় থাকিবে—নিয়তির নিদারুণ চক্রনেমী যে তোমাদের উপর আসিয়া পড়িল?" * (১)

কি অদ্ভুত চিত্র! নন্দনে নরকে, দেবতায় পিশাচে এমন কোলাকুলি মিশামিশি করিয়া রহিয়াছে; আঁধারে জ্যোতিতে, পরমপাপে পরমপুণ্যে এমন জড়াইয়া জড়াইয়া মিলাইয়া গিয়াছে—তাহাদের আর পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় নাই। কবির কাব্যজগতের উপকরণ তাঁহার বালবৃদ্ধাদের মতই দেখিতে জীর্ণ দুঃস্থ গলিত কলুষিত কিন্তু ঠিক তাহাদেরি মত

"শত ছিদ্র আবরণের অন্তরালে, হিমজড় খোলসের নীচে, তবুও কি একটা জীবন এখানে জাগিয়া আছে—"

বাহিরে যতই কুৎসিত কদর্য্য হউক না এই অন্তরের এই প্রাণের দিক দিয়া দেখ, দেখিবে

(১) Je vois s'épanouir vos passions novices;
Sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus;
Mon cœur multiplié jouit de tout vos vices!
Mon âme resplendit de toutes vos vertus!
Ruines! ma famille! ô cerveaux congénères!
Je vous fais chaque soir un solennel adieu!
Où serez-vous demain, Eves octogénaires,
Sur qui pèse la griffe effroyable de dieu!

"ইহাদেরও চাহনীতে মাখা আছে কি একটা শিশু সুলভ সরল অজানা সৌরভ—
ইহাদেরও আছে কি একটা নিভৃত সৌন্দর্য্য, স্বর্গীয় সুষমা, দিব্য ভাব,"

"এই সব দৃষ্টিতে তবুও আছে কি নিবিড় রহস্য, কি অজেয় আকর্ষণ।"

বোদেলের একটা অতিমাত্র স্থূল, উৎকট ইন্দ্রিয়পরতার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাহারই উপর ভর দিয়া কি সূক্ষ্মে ইন্দ্রিয়াতীতে উঠীয়া গিয়াছেন। তাঁহার বালবৃদ্ধাদের মতই তিনি অন্তরাত্মার কোন তীব্র রসায়নে বিষকে অমৃতে পরিণত করিয়াছেন—

"—বেদনাকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছেন"—

পাপকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে পারিয়াছেন, দেবতার কাছে চল,

"হে পরাক্রমী দৈত্য, আমাকে স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দাও।"

বোদেলের নরকের অধিবাসী, পিশাচের—শয়তানের পূজারী; কিন্তু আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি, কে এ শয়তান, কি জন্য তাহার নরকবাস? এ যে স্বর্গেরই অধিবাসী, এ যে সেই দেবতা—এঞ্জেল—পৃথিবীর মানবের দুঃখ দৈন্য দেখিয়া একদিন যাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠীয়াছিল, মর্ত্তের "তমসা গূঢ়" তমোরাজি দেখিয়া স্বর্গের আলো যাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ত তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া উঠিয়াছে এই ধ্বনি

"ওগো আমার দোসর—ওগো আমার ভাই।" (১)

তাই ত সে ছুটিয়া আসিয়াছিল জগতের বেদনা যন্ত্রনা কলুষতার মধ্যে, যেখানে সে দেখিতে পাইয়াছিল শুধু

(১) ——Mon semblable—Mon frère !

"ফাঁসিকাঠের একটা প্রতিমা আর তাহাতে ঝুলিয়া আছে তাহারই ছায়াটি"—

দেবতার মত এঞ্জেলের মত সে মুখ ফিরাইয়া লইতে চাহে নাই, দূর হইতে মানুষকে জগৎকে—দুঃখীকে পাপীকে পর ভাবিয়া কেবল একটুখানি করুণা দেখাইয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই। সে চাহিয়াছে মানুষের জগতের নরকের সহিত হৃদয় মিলাইয়া দিতে, এক হইয়া যাইতে, সে চাহিয়াছে

"সেই শক্তি সেই সাহস যেন নিজের হৃদয় নিজের দেহের প্রতি নির্নিমেষ চাহিয়া দেখিতে তাহার কোন ঘৃণা না হয়।"

মানুষের মধ্যে পিশাচকে শয়তানকে দেখিতে পাইতেছ, কিন্তু কে সে?

সে যে

"একটা ভাব, একটা রূপ, একটা সত্তা, সুনীল গগন হইতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়াছে একটা পঙ্কিল তামসী বৈতরণীর মধ্যে—সেখানে যে স্বর্গের কোন দৃষ্টিই আর প্রবেশ করিতে পায় না।" (১)

সে যে

"একটি দেবতা, কুৎসিতের প্রেমে ভুলিয়া অতি দুঃসাহসে গহন পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—" (২)

(১) Une Idée, une Forme, un être
Parti de l'azur et tombé
Dans un Styx bourbeux et plombé
Où nul œil de cielne pénètre.

(২) Un Ange, impudent voyageur
Qu'a tenté l'amour du difforme—

এই এঞ্জেল স্বর্গ ছাড়িল কেন, তাহার সহবাসী আর আর এঞ্জেল সকলকে অস্বীকার করিল কেন? শুনুন তবে তাহার প্রাণের কথা—

"ওগো আনন্দের দেবতা! তুমি চেন কি শোক, লজ্জা, অনুতাপ, রোদন, অবসাদ?

*** *** ***

ওগো প্রীতির দেবতা! তুমি চেন কি বিদ্বেষ, আঁধারে বদ্ধমুষ্টি, বিষের অশ্রুধারা?

*** *** ***

ওগো স্বাস্থ্যের দেবতা! তুমি চেন কি ঐ সব ব্যাধি, ঐ যাহারা মলিন আতুরাশ্রমের-বিপুল-দেয়ালের-পাশ দিয়া পাশ দিয়া, নির্ব্বাসিতের মত, টলিতে টলিতে চলিয়াছে?

*** *** ***

ওগো সৌন্দর্য্যের দেবতা! তুমি চেন কি লোলচর্ম্ম, বার্দ্ধক্য-ভীতি, সেই দারুণ মর্ম্মন্তুদ যাতনা সকল?"

*** *** *** " (১)

(১) Ange plein de gaîté, connaissez-vous l'angoisse,
La honte, les remords, les sanglots, les ennuis ...
*** *** ***
Ange plein de bonté, connaissez vous la haine,
Les poings crispés dans l'ombre et des larmes de fiel ...
*** *** ***
Ange plein de santé, connaisez vous les Fièvres,
Qui, le long des grands murs de l'hospice blafard,
Comme des exieés s'en vont d'un pied trainard ...
*** *** ***
Ang. plein de beauté, connaissez-vous le rides,
Et la peur de vieillir et ce hideux tourment.
*** *** ***

সুখের স্বস্তির স্বাস্থ্যের মঙ্গলের—তোমরা যাহাকে সৌন্দর্য্য বল, সে সকলের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই—তাহার চিন্তা তাহার প্রাণ ছুটিয়াছে—

"কেবল তাহাদেরই দিকে যাহারা হারাইয়াছে এমন বস্তু, হারাইলে যাহা কখন পাওয়া যায় না, কখন পাওয়া যায় না! তাহাদেরই দিকে যাহারা আপন নয়নজলে আকণ্ঠ নিমগ্ন, যাহারা বেদনা-বাঘিনীকেই স্নেহময়ী জননীরূপে পাইয়াছে, তাহারই স্তন্য পান করিয়াছে! সেই সব পিতৃ মাতৃহীন অস্থিচর্ম্মসার শিশুদিগের প্রতি যাহারা শুষ্ক কুসুমের মত ঝরিয়া পড়িতেছে!" (১)

আহা! শুনুন তাহার প্রাণের ব্যাথা—

"মন যেন আমার কোন অরণ্যে নির্ব্বাসিত! কি একটা পুরাতন স্মৃতি যেখানে বিষাণের মত তারস্বরে ফুকারিয়া উঠিতেছে! আর আমার প্রাণে জাগিতেছে কেবল সেই সব নাবিকদের কথা, যাহা-দিগকে একটা অজানা দ্বীপের মধ্যে ভুলিয়া ফেলিয়া আসা হইয়াছে, জাগিতেছে যত বন্দীদের কথা, যত পরাজিতদের কথা!...আরও কত জনার কথা!" (২)

(১) A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve
Jamais! jamais! à ceux qui s'abreuvent des pleurs
Et tettent la Douleur comme une bonne louve!
Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs!

(২) Ainsi dans la forêt où mon esprit s'éxile
Un vieux souvenir sonne à plein souffle de cor!
Je pense aux matelots oubliés dans une île,
Aux captifs, aux vaincus!.....à bien d'autres encor!

এই সকল নগণ্য ঘৃণিত বিস্মৃত সত্তাদের প্রতি কি তীব্র সমবেদনা কি গভীর সহানুভূতি কি অকপট সৌহার্দ্দ আমাদের কবির। তিনি ইহাদের অন্তরাত্মার মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছেন, আপনার অন্তরাত্মার মধ্যে ইহাদেরই স্বরূপখানি অঙ্কিত আছে দেখিতেছেন। আমাদের মনে হয় কবি যেন গীতার সেই মহাশিক্ষা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই মহা সাধনার সিদ্ধি লাভই করিয়াছেন—

সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি—
ঈক্ষতে যোগ-যুক্তাত্মা—

কবিকে যে ঋষি বলা হয় তাহা কি অহৈতুক? কবি হইতেছেন স্বভাব যোগী। আর ঠিক এই জন্যই আমাদের কবিও কি একটা অনন্ত চিরন্তন সত্যের, পরম সৌন্দর্য্যের মধ্যেই সব জিনিষ তুলিয়া ধরিয়াছেন; বীভৎসকেও শ্রীসমুন্নই করিয়া তুলিয়াছেন—পশুকে প্রায় দেবতার কাছে, নরককে স্বর্গের দুয়ারে লইয়া গিয়াছেন।

কবির মনে প্রথমে স্বর্গে ও নরকে, দেবতা ও পশুতে, গন্ধর্ব্বে ও পিশাচে একটা দ্বন্দ্ব জাগিয়া উঠিয়াছিল—তখন তিনি স্বর্গ দেবতা গন্ধর্ব্বকে ছাড়িয়া নরক পশু পিশাচকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে কবি যত গভীরে যাইতেছেন ততই দুইশ্রেণীর সে দ্বন্দ্ব তাঁহার চক্ষে ঘুচিয়া যাইতেছে। তিনি এখন দেখিতেছেন নরক যে স্বর্গেরই উল্টা দিক। পশুর উপর ভর করিয়াই যে দেবতা দাঁড়াইয়া আছে, পশু হইতেছে দেবতার বাহন। বিষ ও অমৃত একই সামগ্রী হইতে প্রস্তুত, একই জিনিষের দুই রকম রসায়ন। জগৎ তমিস্রপূর্ণ কিন্তু এ তমোরাশী স্বর্গই ঢালিয়া দিতেছে, ইহা স্বর্গেরই ছায়া—

"এই অভাগা অসাড় জগতের উপর রাশি রাশি অন্ধকার ঢালিয়া দিতেছে ঐ আকাশ।" (১)

জীবের যে দূরবস্থা দেখিতেছ, তলাইয়া দেখ ত সেটা কি?

"দূর গগনের পারে যে সব নক্ষত্ররাজি জ্বলিতেছে, তাদেরই করুণা দীপ্তিতে ভস্মীভূত নয়নে আমার জাগিতেছে কত সূর্য্যের কেবল স্মৃতি গুলি।" (২)

মানুষ ছুটিয়াছে ভগবানকে পাইবার জন্য, কিন্তু সে তাঁহাকে ধরিতেছে পিছন হইতে, ধরিতেছে তাঁহার ছায়াদেহ—মানুষ চাহিতেছে আলোক, তাই সে পাইতেছে অন্ধকার—

"দিগন্তের পানে ছুটিয়া চল, সময় বহিয়া গিয়াছে, চল ত্বরা—শেষ দিক দিয়া অন্ততঃ একটা বাঁকা কিরণলেখা ত ধরিতে পাইব! কিন্তু দেবতা যে কেবল সরিয়া সরিয়াই যাইতেছে আর আমি বৃথা তার পশ্চাতে ছুটিতেছি; রাত্রিও ত অদম্য প্রতাপে ঘনাইয়া আসিতেছে।" (৩)

উপর হইতে কে আমায় টানিতেছে, তাই ত আমাকে পৃথিবীর উপর জোর করিয়া পৃথিবীকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিতে হইতেছে—

(১) Et le ciel versait des ténèbres
Sur ce triste monde engourdi—

(২) C'est grace aux astres nonpareils
Qui tout au fond du ciel flamboient
Que mes yeux consumés ne voient
Que des souvenirs des soleils!

(3) Courons vers l' horizon, il est tard, courons vite,
Pour rattraper au moins un oblique rayon!
Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire;
L'irrésistible Nuit établit son empire!—

"আমার চক্ষু আকাশের দিকে, তাই ত আমি পড়িতেছি খানার মধ্যে।" (১)

চারি দিকে দেখিতেছি প্রকৃতির এই যে দুঃস্থ সাজ, জীবের এই ছিন্ন বস্ত্র, জীর্ণ দেহ, দীর্ণ বুক, হে ভগবান, এসব সেই

"যে তীব্র ক্রন্দনরোল যুগের পর যুগ ঠেলিয়া আসিয়া তোমারই অনন্তের বেলাভূমে আছাড়িয়া পড়িতেছে।" (২)

মাটির উপর কে পড়িয়া আছ, কর্দ্দমের মধ্যে কে ডুবিয়া গিয়াছ? আমি শুনিতেছি কে যেন কোথা হইতে তোমাদিগকে ডাকিতেছে—

"এস, ওগো, এস, বাস্তবকে ছাড়াইয়া, পরিচিতকে অতিক্রম করিয়া, স্বপ্নের মধ্যে ভেলা ভাসাইবে চল।" (৩)

উপরের আলোকের অনন্তের একটা নিবিড় স্মৃতি, গোপন উপলব্ধি লইয়া কবি ছুটিয়াছেন নীচের আঁধারের সঙ্কীর্ণের দিকে, তাই এই নীচ এই আঁধার এই সঙ্কীর্ণের মধ্যেই কেমন খেলিতেছে সেই উপর সেই আলোক সেই অনন্ত; স্বর্গ হইতে তিনি নামিয়া পড়িয়াছেন নরকের মধ্যে, নরকেও তাই কেমন স্বর্গের দীপ্তিতে প্রায় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; বীভৎসের পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া ধরাইয়া দিতেছে কেমন একটা সৌম্যেরই পথ। কবি সত্যকে সুন্দরকে সম্মুখ হইতে দেখেন নাই, তিনি দেখিয়াছেন পশ্চাত হইতে, তির্য্যক ভাবে (oblique rayon), কিন্তু তাহা সত্যেরই সুন্দরেরই দৃষ্টি।

(১) Les yeux au ciel, je tombe dans des trous! ‡
(২) ——ardent sanglot qui roule d'âge en âge
Et vient mourir au bord de votre éternité!
(৩) ——Viens! oh! viens voyager dans les rêves
Au de là du possible, au de là du connu!

কুটিলের, বিকৃতের, বিকটের মহাসাগরে তিনি সাঁতার দিতেছেন, তবুও তাহা মহাসাগরই।

বোদেলের মোটেই বস্তুতন্ত্র নহেন, বরং আমরা তাঁহাকে বলিব মিস্‌টিক (Mystic), আধ্যাত্মিক কবি। তাঁহার সাজাত্য যদি থাকে, তবে তাহা জোলা বা মোপাসাঁ'র সাথে নয়, তাহা ইট্‌স্, এ-ই বা রবীন্দ্রনাথ, মেটারলিঙ্ক বা ভেরলেন'এর সাথে। আধ্যাত্মিক কবি অর্থাৎ সেই কবি যিনি বস্তুর অন্তরাত্মার রহস্যের কথা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, এ জগৎকে প্রত্যক্ষকে ছাড়াইয়া দিয়া স্থূলকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে দিতেছেন আর একটা জগতের আভাস, একটা অনন্তের অনির্দ্দেশ্যের অবাঙমানসগোচরের ইঙ্গিত, তিনি চলিতে পারেন দুইটি পথে এক হইতেছে উপরের ভগবানের স্বর্গের আলোকের তত্ত্বের বা তথ্যের পথ—মিস্‌টিক কবিগণ এই পথই প্রায়শঃ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য, তাহার অন্তরাত্মার কথা, তাহার মধ্যে অনন্তের অনির্দ্দেশ্যের ভাব কেবল উপরের দিকেই উঠিয়া গেলে যে পাই এমন বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও পারে। ফলতঃ উপরের কথা ছাড়িয়া নীচের কথা, পরমাত্মা আত্মা অমৃতত্বের (God Soul, Immortality) তত্ত্ব বা তথ্য ছাড়িয়া সাধারণ জীবনের কথা, স্থূল অনুভূতি, প্রাকৃত আবেগের কথা লইয়াই যদি থাকি এবং উপরের যে সিদ্ধ-মিস্‌টিক কবি একজন যতখানি উঠিয়া গিয়াছেন, নীচের দিকেও আমি ততখানি নামিয়া যাই—তবে দেখিব সেখানেও আমি পাইতেছি সেই একই অধ্যাত্ম জগৎ, রহস্যলোক মিস্‌টিক আবহাওয়া—কবিত্বের সেই সূক্ষ্ম অরূপের রাজ্য। বৈদিক ঋষি যেমন বলিতেছেন উপরে এক মহা সাগর—এক বিপুল অন্ধকার

নীচে আর এক মহাসাগর আর এক বিপুল অন্ধকার, মাঝখানে শুধু সৃষ্টির জাগ্রতের আলোক রশ্মিটি তির্য্যকভাবে নিপতিত। মাঝখানের আয়তনটিই হইতেছে আমাদের পরিচিত ইন্দ্রিয় বুদ্ধির পরিচিত আয়তন—যাহা সহজ সুলভ সাধারণ বস্তুতন্ত্র গদ্যাত্মক—উপরে ও নীচে হাত ধরাধরি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া পিছনে এক অনন্তের রহস্যের মহা সৌন্দর্য্যের মিস্‌টিক রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে। ইটস্, এ-ই বা আমাদের রবীন্দ্রনাথ উপরের ওপারের দিকে চলিয়াছেন, বোদেলের এ পারের অনুভূতির মধ্যেই খুঁড়িয়া চলিয়া একটা নীচের ওপারে গিয়া পড়িয়াছেন—উভয়েই পাইয়াছেন একই মিস্‌টিক অধ্যাত্ম রাজ্য।

আমরা যে রূপান্তরের যে যাদুবিদ্যার যে অদ্ভুত রসায়নের কথা বলিয়াছি তাহার রহস্য ঠিক এইখানেই। পাঠক ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট উদাহরণ পাইয়াছেন, তবুও আরও কয়েকটি আমরা আবার দিতেছি, শুনুন অতিমাত্র ইন্দ্রিয়গত যাহা তাহার উপর ধ্যান বলে কবি কি রকম সমাধিস্থ হইয়াই যেন—অতীন্দ্রিয়ের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন—

"তাঁহার সুগভীর চক্ষুকোটর রিক্ততা আর অন্ধকার জড় করিয়া গড়া, মাথার খুলিটি তাহার ফুল দিয়া সুচারুরূপে মণ্ডিত—জীর্ণ মেরুদণ্ডের অস্থিশ্রেণীর উপর সেটী কেমন আবার ধীরে ধীরে দুলিতেছে! আহা! একটা মহাশূন্য মিথ্যার আভায় উদ্ভাসিত হইয়া কি কুহকই না ছড়াইতেছে! (১)

(১) Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres,
Et son crône, de fleurs artistement coiffé
Oscille mollement sur ses frêles vertebres
—O charme d'un néant follement attifé!

অথবা—

"তখন, ওগো রূপসী আমার! যে সব কৃমিকীট চুম্বনে চুম্বনে তোমায় খাইয়া ফেলিতে থাকিবে, তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও যে আমার পচা গলা প্রেম রাজির দিব্যরূপ যাহা, অন্তঃসার যাহা সেকুটু কিন্তু অক্ষতভাবে আমারই কাছে রাখিয়া দিয়াছি।" (১)

ঊর্দ্ধের আলোকের কবি হয়ত যখন বলিবেন—

"সব সঙ্গীত তাঁহারই হাসির রোল, সব সৌন্দর্য্য তাঁহারই তীব্র আনন্দের দীপ্তি, আমাদের জীবন তরঙ্গ তাঁহারই হৃদয় স্পন্দন; আমাদের উল্লাস রাধাকৃষ্ণের রাসলীলা, আমাদের ভালবাসাবাসি তাঁহাদেরই প্রেম চুম্বন।" (২)

বোদেলের তখন গাহিয়া উঠিবেন—

"আমিই ছুরিকা, আমিই ক্ষত; আমিই গণ্ড, আমিই চপেটাঘাত; আমিই চক্রনেমী, আমিই নিষ্পিষ্ট দেহ; আমিই হত, আমিই হন্তা।" (৩)

(১) Alors, ô ma beauté! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours decomposés.

(২) All music is only the sound of His laughter
All beauty the smile of His passionate bliss;
Our lives are His heart-beats, our rapture the bridal
Of Krishna and Radha, our love is their kiss—
(Ahana and other poems)

(3) Je suis la plaie et le couteau!
Je suis le soufflet et la joue!
Je suis les membres et la roue,
Et la victime et le bourreau!

কিন্তু উভয়ে একই বৈদান্তিক সত্য ও সৌন্দর্য্যকে ফুটাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তবে বিভিন্ন সংজ্ঞায় ; পার্থক্য যাহা তাহা পরিভাষায়।

মিস্‌টিক কবিই বল আর আধ্যাত্মিক কবিই বল তিনি হইতেছেন সেই কবি যিনি জগতের আছে যে একটা বাহ্য নামরূপ, একটা স্ফুট অর্থ সে দিকে ততখানি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না যতখানি করিতেছেন তাহার আছে যে একটা স্বভাব ও স্বরূপ, একটা নিগূঢ় অর্থ (esoteric meaning) সেই দিকে। এই গুপ্ত অভিব্যঞ্জনাকে ফুটাইয়া ধরিবার জন্যই জগতের বাহ্য নামরূপ অর্থ যেখানে যতটুকু যে ভাবে প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার চোখে সমস্ত প্রকৃতি ভিতরের একটা অশরীরী সত্তার প্রতীক বা বিগ্রহ মাত্র—এ-ই বলিতেছেন আত্মার পরিচ্ছেদ (vesture of the soul) হইতেছে প্রকৃতি। তিনি দেখেন একটা সূক্ষ্ম বিরাট শক্তির বা চেতনার লীলা, স্থূল বস্তু স্থূল ঘটনা কেবল তাহারই ইঙ্গিত, সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র। তাই বোদেলের বলিতেছেন—

"জগৎ যেন একটি বিপুল বনশ্রেণী, আর মানুষ ক্রমাগত তাহার ভিতর দিয়া চলিয়াছে—মানুষের চারিদিকে তরুলতার মত ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া এই সব কিসের অফুরন্ত সঙ্কেতরাজী কত পরিচিতের মতই না তাহাকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। (১)

তবে অন্যান্য কবির সহিত আমাদের কবির পার্থক্য এই যে ইনি একটা বিশেষ ধরণের সিম্বল বা সঙ্কেত, সংজ্ঞা বা পরিভাষা ব্যবহার

(১) L'homme y passe à travers des forêts de symboles
Qui l'observent avec des régards familiers.

করিতে ভালবাসেন—এগুলি কেবল কুৎসিত কালো করুণ পীড়াদায়ক, ইহারা শোভন নয় উজ্জ্বল নয় প্রীতিকর নয়—ইহাতে অভাব আলোর হাওয়ার স্বস্তির স্বাচ্ছন্দ্যের মুক্ত খেলা। কিন্তু তাহাতে খুব বেশী আসে যায় নাই, আসল বস্তুটি—সেই অনন্তকে অশরীরীকে অতীন্দ্রিয়কে তিনিও এই সকলের মধ্য দিয়াই ফুটাইয়া ধরিয়াছেন। কবির চোখে পড়িল অন্ধের দল, তিনি তাহাদের চিত্র দিলেন এই ভাবে—

"অপার অন্ধকারের ভিতর দিয়া ইহারা চলিয়াছে—এই সব চিরন্তন নিস্তব্ধতার প্রতিমূর্ত্তি সব।" (১)

গৃহহীন পথসর্ব্বস্বদিগকে (Bohémien) দেখিতেছেন আর বলিতেছেন—

"এই সব যাত্রী কেবল চলেইছে, ইহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত—তাহাদেরই অতি পরিচিত যে গহন অন্ধকার সমস্ত ভবিষ্যতকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।" (২)

আমরা পূর্ব্বে যে Martyre, যে Gibet Symbolique, যে বালবৃদ্ধাদের কথা বলিয়াছি সে সবও এখানে আবার স্মরণ করা যাইতে পারে।

বোদেলের স্বর্গের কবি নহেন, তাঁহার মধ্যে আলোর জ্যোতির স্নিগ্ধতার একান্তই অভাব দেখিতেছি। প্রধানত তিনি নরকের তমিস্রের বীভৎস বিভীষিকার কবি। এ সকলেরও গিয়াছেন তিনি

(১) Ils traversent ainsi le noir illimité
Ces fréres du silence éternel.

(২) ————Ces voyageurs pour lesquels est ouvert
L'empire familier des ténébres futures !

চরমে, তাই বোধ হয় ঘুরিয়া আবার যেন এক রকম স্বর্গেরই দুয়ারে উপস্থিত হইয়াছেন। তবুও আমরা অনুভব করি বোদেলের যে আলোকের যে জ্যোতির যে সমুচ্চের সন্ধান পাইয়াছেন তাহাতে মিশিয়া আছে মশালের রক্ত আভা ও উত্তাপ, প্রভাতের সহজ সরলতা সেখানে নাই। দানবের স্বর্গস্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, সত্য কথা, কিন্তু ফুটিয়া উঠে নাই দেবতার সাক্ষাৎ অসম্বৃত উপলব্ধি। তিনি যখন বলিতেছেন—

"ওগো আলো! ওগো রঙ্। আমার ঘন কৃষ্ণ সাইবেরিয়া দেশের উত্তাপ চূর্ণ!" (১)

অথবা—

"নিশীথের গগন মণ্ডপেরই মত স্বর্গে তুলিয়া ধরিয়া তোমাকে আমি পূজিতেছি, ওগো দুঃখের সাজি! ওগো বিপুল নিরবতা!" (২) তখন আমরা প্রায় স্বর্গেরই দুয়ারে—কিন্তু তবুও দুয়ারে মাত্র।

ইহাই আমাদের কবির প্রধান কথা—কিন্তু ইহাও আবার সব নয়। বোদেলের পাতিত্যের চরমে গিয়াছেন—চরমে চলাই তাঁহার প্রাণের ধর্ম্ম—তিনি চরমে গিয়া নামিয়াছেন, কিন্তু কি রকমে ঠেলিয়া আবার চরমেই উঠিয়াছেন, তাহারও ইঙ্গিত যে তিনি দেন নাই তাহা নয়। মনে হয়, পৃথিবী খুঁড়িতে খুঁড়িতে তিনি ভূগর্ভের অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিত ধাতুস্রাবের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু

(১) Toi, lumiére et couleur!
Explosion de chalenr
Dans ma noire Siberie!

(২) Je t'adore à l'égal de la voute nocturne
O vase de tristesse, ó grande taciturne!

সেখানেই থামেন নাই, আরও বরাবর খুঁড়িয়া চলিয়াছেন—পৃথিবী ভেদ করিয়া ওপারে আবার আলোকের আকাশের অসীম বিস্তারেই পক্ষ উড্ডীন করিয়া দিয়াছেন। স্বর্গের স্মৃতি শুধু নয়, তিনি পাইয়াছেন স্বর্গ-দৃষ্টিই; বিপরীত সংজ্ঞায় দেবলোকের রূপক নহে, সহজ দেবভাষাতেও দেবলোকের স্ফুটকাহিনী বলিয়াছেন। গভীর অমানিশার পারেই তাঁহার সেই অধ্যাত্ম উষা (L'Aube Spirituelle) উদিত হইয়াছে—

"কি একটা অদ্ভুত শক্তির বিপরীত লীলায় তন্দ্রাজড় পশুর মধ্যে হইতেই দেবতা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।" (১)

আরম্ভে পাই বটে—

"এক কর্দ্দমাকীর্ণ ঘনঘটাচ্ছন্ন বৈতরিণী, যেখানে স্বর্গের কোন দৃষ্টিই প্রবেশের পথ পায় না।"

কিন্তু সর্ব্বশেষে দেখি—

"আর এক মহাসাগর, জ্যোতি যেখানে ফাটিয়া পড়িয়াছে, আর কেমন সে সুনীল, কেমন স্বচ্ছ, কৌমার্য্যের মতনই সুগভীর রহস্যে ভরা।" (২)

কবি যাহাই বলুন না, যে পথেই চলুন না, তাঁহার চরম আদর্শটি—

(১) Par l'opération d'un mystère vengeur
Dans la brute assoupie un ânge se réveille

(২) —Un autre océan où la splendeur éclate,
Bleu, clair, profond comme la virginité.

"বিশুদ্ধ আলো দিয়াই গড়া—সে আলো তিনি আহরণ করিয়াছেন আদিম কিরণরাজীর একটা পরম পবিত্র উৎস হইতে।" (১)

বোদেলের অন্যান্য কবিদের ন্যায় শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের আরাধনা করেন নাই, তিনি করিয়াছেন ঘোরা প্রকৃতির পূজা। কিন্তু শ্মশান কালীর সাধকের মতই তিনি শেষে পাইয়াছেন সেই মহাদেব শিবের দেখা। বোদেলের হইতেছেন তান্ত্রিক, বামাচারী, অঘোর পন্থী কবি সাধক। গলিত শবের সহায়ে মহাজীবন, গরলের সহায়ে অমৃত বীভৎসের সহায়ে অতি সুন্দর অনাচারের সহায়ে মুক্তধর্ম্ম, ঘোর তমিস্রের সহায়ে দিব্যজ্যোতি, নরকের সহায়ে স্বর্গ ইন্দ্রিয়ের সহায়ে অতীন্দ্রিয়, সঙ্কীর্ণ সসীমের সহায়ে অনন্ত অসীম লাভ করাই তান্ত্রিক সাধনা—বোদেলেরও তাহাই করিয়াছেন। বেদান্ত সাধনার কবি অনেক পাইয়াছি, তন্ত্রের ভোগসাধনার কবিও যথেষ্ট আছে, শক্তিসাধনার কবিও আছে—কিন্তু তন্ত্রের অঘোরপন্থা কবিত্বে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, কলুষকালিমাময় আধিব্যাধিজীর্ণ হতাশাপ্রপীড়িত অবসাদগ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের লীলা ক্ষেত্র এই আমাদের আধুনিক জগতের প্রতিনিধি, দুঃখের পাপের ফুলঝুরি বানাইয়াছেন যিনি, সেই কবি বোদেলের।

আমাদের কবির ইষ্টদেবতা হইতেছেন এক

"ঘোরা তপ্তরক্তা মোহিনী" (২)

তাঁহার চোখে জাগিয়া আছে—

(১) Il ne sera fait que de pure lumière,
Puisée au foyer saint des rayons primitifs——

(২) Nymphe ténébreuse et chaude.

"বন্ধ্যানারীর একটা হিমনিথর গরিমা" (১)

অথবা—

"কুয়াসা ঢাকা কোন দূর সহরের বুকে কি অজানা বিভীষিকায় মণ্ডিত হইয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে যে একটা প্রস্তর স্তূপ।" (২)

কিন্তু সাধকের দিব্য চক্ষে এ সবই হইতেছে যে—

"কত কত অজানা স্বর্গলোকের তোরণ দুয়ার।" (৩)

শক্তিমান সিদ্ধপুরুষ তাঁহারই যোগ্য ইষ্টদেবীকে পাইয়া বলিতেছেন—

"ঘনগর্জ্জিত তুষার প্রপাতের গলিত ধারায় ক্রমোচ্ছ্বসিত জলস্রোত মত, তোমার মুখের সুধা যখন আমার অধর পর্য্যন্ত বাহিয়া আসে

"তখন আমার মনে হয় কি যেন একটা উচ্ছৃঙ্খল শক্তিতে ভরা তীব্র কটু অজেয় মদ্য পান করিতেছি—"

কিন্তু পরে দেখি—

(1) La froide majesté de la femme stérile.

(2) Un granit entouré d'une vague épouvante,
Assoupi dans le fond d'un sahara brumeux.

(3) C'est le portique ouvert sur les cieux inconnus.

"একটা তরল আকাশই যেন গলিয়া আমার প্রাণের ভিতর যাইতেছে, আমার-প্রাণকে শত-জ্যোতিষ্কে খচিত করিয়া দিয়াছে।" (১)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

---

(১) Comme un flot grossi par la fonte
Des glaciers grondants
Quand l'eau de ta bouche remonte
Au bord des mes dents,
Je crois boire un vin de Bohème,
Amer et vainqueur,
Un ciel liquide qui parsème
D'étoiles mon cœur!

বিলাত প্রবাসীর পত্র

—:০:—

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বহুদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হলুম। আমার চিঠিটা ছাপ্‌তে দিয়ে ভাল করেছেন কি না জানি না। হয় ত অনেক কথা অবিচারিত ভাবে এমন করে লেখা ছিল যা বন্ধুর ক্ষমার উপর ভর না করে দাঁড়াতে পারে না। আমি নিজে অনেক সময়ে প্রকাশ করবার জন্য কিছু লিখ্‌ব মনে করেছি, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার এত দূর থেকে গড়া ধারণা ভুল হতে পারে এই আশঙ্কা করে লিখি নাই, তা ছাড়া আমার হাতে সময় এত কম যে তার থেকে তিলমাত্রও বাঁচান দুঃসাধ্য। যদি আমার চিঠিতে কোনও সময় এমন কিছু পান যা ছাপ্‌লে কোনও ফল হতে পারে বলে মনে করেন ত তা ছাপ্‌তে দিতে পারেন। আমি এমন নাম-করা লোক নই যাতে আমার নামের স্বাক্ষরে লেখার মূল্য বাড়বে এবং ঐ জাতীয় লেখা দ্বারা যে আমার নাম বাড়াব তাও ইচ্ছা করি না।

দেশ থেকে আমার দুই একজন বন্ধু কি মত আমি দেব তাও সূচনা করে দিয়েছিল। অর্থাৎ আমার মত জিজ্ঞাসা করার অবসরে তাঁরা অস্ফুটভাবে এই আশা প্রকাশ করেছেন যে আমি লিখ্‌ব যে আমাদের ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধ্যাত্মিক-পরায়ণ এবং য়ুরোপীয় জাতিবর্গ অত্যন্ত ভোগ-পরায়ণ, ছিন্নকেন্দ্র এবং অধঃপতনোন্মুখ কিম্বা

অধোগামী। আপনার চিঠিতে যে সাহেবটির কথা লিখেছেন, তিনিও দেখ্‌চি সেই রকম কতকটা বলেছেন, এবং আমাদের দেশের দুই একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও সেই রকমই বল্‌ছেন। এবং কেউ কেউ সমস্ত European cultureএর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌চেন। যাঁরা এসব বল্‌চেন তাঁরা আমার চেয়ে সকল বিষয়েই মহত্তর ও যোগ্যতর, এবং ব্যক্তি হিসাবে আমার পূজনীয়। কিন্তু তথাপি আমার মন তাঁদের সঙ্গে সায় দিচ্ছে না। আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের যে অবস্থা তাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার কাছে যেটা ঠিক্ খাঁটি কথা বলে মনে হয় তাই বলা উচিত, মন-রাখা কথা বা হুজুগে কথা বলা উচিত নয়। কোন্ কথা ঠিক খাঁটি তা নিশ্চয় করে বলা যায় না, তবে কোন্ কথা আমার কাছে খাঁটি বলে মনে হয় তা অনেক সময়ে বলা যায়, এবং যখন তা বলা যায় তখন তা বলাও উচিত। হয় ত তা প্রিয় না হতে পারে, কিন্তু শুধু প্রিয়ই বল্‌ব এটা বাদ্‌শাহের আমীর ওম্‌রাহের কাজ হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিমাত্রেরই সেটা কর্ত্তব্য এ কথা বলা চলেনা যদিও 'ন বদেৎ সত্যমপ্রিয়ম্' এই অনুষ্টুভ্ ছন্দের শাস্ত্র নিশ্চয়ই এতে আমার উপর তর্জ্জন করে উঠ্‌বেন।

এই ইংরেজ জাতির মধ্যে আমি এক বৎসর বাস কর্‌লুম্ এবং এদের উত্তমাধম অনেক রকমের লোকও দেখ্‌লুম্; এদের প্রধান দোষ হচ্ছে এই যে সবজাতির চেয়ে নিজদের শ্রেষ্ঠ মনে করে, এবং সর্ব্বত্র নিজেদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে চায়। এবং সেই জন্য অন্য জাতির সঙ্গে ব্যবহারেও যে ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায় না তা নয়, বিশেষতঃ কালো বা কটা জাতির সঙ্গে ব্যবহারে। এ দোষটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ জাতির

শক্তি কোথায় তার অনুসন্ধান কর্‌তে গেলেত শুধু তার দোষটার দিকে দেখ্‌লে চল্‌বে না। আমরা যদি নিজেরা সত্য সত্য শক্তি অর্জ্জন, ধারণ ও পোষণ করতে চাই তা হলে অন্য অন্য জাতির শক্তিকেন্দ্র তারা কেমন করে শক্তি সঞ্চয় করে তারই খোঁজ করা আবশ্যক, তাদের দোষটি শুধু উল্টে পাল্টে ব্যাখ্যা করে নিজের মাহাত্ম্য বাড়ালে কোনও লাভ নেই বা তারা একদিন নিশ্চয় ধ্বংশ পাবে লোপ পাবে এ কথা মনে করে বিদ্বেষ বহ্নিতে আহুতি দিলেও কি ঐহিক, কি পারমার্থিক কোনও দিকেরই লাভ নাই। আপনি লিখেছেন "যে দিন * * হাজতে পাঠানো হয় সেদিন কাছারী প্রাঙ্গনে এক অপূর্ব্ব অভাবনীয় জনতা দেখেছি, "যায় যাবে জীবন চলে" প্রভৃতি গান গাইতে গাইতে যখন বন্দীর দল অসংখ্য লোকের অভিনন্দন লইতে লইতে কাছারীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আর মুহুর্মুহুঃ 'বন্দেমাতরম্' 'স্বাধীনতাকি জয়' 'গান্ধীকি জয়' ধ্বনিতে গগন নিনাদিত হয়ে উঠ্‌ছিল, তখন এক স্মরণীয় মুহূর্ত্ত না দেখ্‌লে তা উপলব্ধি করা যায় না। সত্যই দেশে নূতন বন্যা এসেছে। আমদের বাঙ্‌লা দেশে হয় অনাবৃষ্টি, নয় বন্যা এই দুইই হতে দেখেছি, কিন্তু কখনও ধীরে ধীরে জল বাড়্‌তে দেখি নাই বা শুনি নাই। এ দেশে বন্যা হয় না, আস্তে আস্তে বাড়ে এবং যা বাড়ে তা আর কমে না। বাঙ্‌লা দেশ সম্বন্ধেই আমি বিশেষ করে বল্‌চি এই জন্য ভারতবর্ষ কথাটা বড় মস্ত, আমি তার কিছু জানিও না, এবং গোটা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও এক কথা বল্‌তে হলে অনেক বিবেচনা করে বলা উচিত। বাঙ্‌লা দেশ feelingটা বোঝে ভাল। সেই জন্য কবিতায় বাঙ্‌লা দেশের খ্যাতি পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

ধর্ম্মের ইতিহাস খুঁজলেও দেখি যে খাঁটি জ্ঞানের ধর্ম্ম বাঙলায় ঠাঁই পায় নি। হয় কোমল প্রেমের ধর্ম্ম নয় উদ্দাম পাঁঠামহিষ-কাটা শাক্ত ধর্ম্ম এই দুইটাই বাঙলাদেশে প্রাধান্য লাভ করেছিল। Logicটা কি ভাগ্যে নবদ্বীপে মিথিলা থেকে আমদানী হয়েছিল। কিন্তু ভট্টাচার্য্যেরা তাকে এমন কোণঠেসা করে ফেলেছিলেন যে তার আপন জালেই আপনি এমন জড়িত হয়ে পড়েছিল যে সেইখানেই তার শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাঙালীর উত্তেজনার অনেকখানিই Romantic রকমের। অনেকখানিই উচ্ছ্বাস, বুদ্বুদ, কথার ফেনা। খাঁটি fact এতটুকুকে মনের ভাবাবর্ত্তের তাড়নায় এতবড় করে মনের সাম্‌নে ধরা এইটিই হচ্ছে আমাদের সাধারণ বাঙালীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমি এ কথা বল্‌চিনা যে সত্য সত্য শক্তিসঞ্চয় বাঙালী কর্‌তে পারে না, আমি বল্‌চি তার মন সে দিকে তেমন যেতে চায় না যতটা সে চায় একটা romantic scene, একটা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস। উচ্ছ্বাসটাই আমাদের বাঙালীর চোখে একটা মস্ত reality, being an end in itself and having an end in itself উৎসাহ বা উচ্ছ্বাসের বশে বাঙালী অনেক বড় কাজও করে ফেল্‌তে পারে, আবার একেবারে দিশাহারা হয়েও যেতে পারে।

এই দেশের লোকের চরিত্র ঠিক্ এর বিপরীত। মায়ের কোলে যোগ্য ছেলে মরে যেতে দেখেছি কিন্তু চোখে একবিন্দু জল দেখিনি, অথচ "দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্রনমুহ্যতি" এ গীতার শ্লোকও এরা আওড়ায় না বা আওড়াবার প্রয়োজন বোধ করে না। A fact with the English people is merely a fact and nothing more

কিন্তু আমাদের চোখে factটা সামান্য তার ideal valueটাই সব চেয়ে বড়। আমাদের দেশ থেকে প্রথম এদেশে এলেই মনে হবে যে এরা কি ভোগবিলাস ভালবাসে। আমি এখানে এক ছুতরমিস্ত্রীর বাড়ীর ২টা ঘর ভাড়া নিয়ে আছি। কিন্তু আমার বস্‌বার ঘরটি এমন কার্পেট্‌পাতা দেওয়ালে এমন রঙিন্ কাগজ দেওয়া, এমন সুন্দর সুন্দর সোফা ও কুশন চেয়ার যে এরকম একখানি ঘর মহারাজা কাশিমবাজারের বাড়ীতেও অনেকগুলি নাই, আবার আর একদিকে তাকিয়ে দেখুন, ছুতরমিস্ত্রীর স্ত্রী সকাল থেকে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অনবরত খাট্‌ছে, মাজাঘষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, করা খাট্‌ছেই খাট্‌ছেই খাট্‌ছেই। ভোগের ব্যবস্থা আছে কিন্তু ভোগকে এরা কখনও অবলম্বন করে থাকে না। এই য়ুনিভার্সিটির একটা ছেলেকে বাবুগিরি কর্‌তে দেখিনি। কিন্তু আমাদের বাঙলা দেশে দেখেছি যে অনেক তরুণ বয়স্কদের সাজসজ্জা যেন মেয়েলীচঙের সস্তায় বাবুগিরির চেষ্টাটা যেন খুবই বেশী। ভোগও এদের আছে কাজও এদের আছে; কিন্তু ভোগের জন্যই এরা কাজ করে এ কথা ঠিক্ মনে হয় না। এরা কাজ করে কাজের জন্য, ভোগ করে ভোগের জন্য।

এদেশের লোকের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু তাদের বীরোচিত ও মনুষ্যোচিত কতগুলি যে আশ্চর্য্য গুণ দেখেছি তা কখনও অস্বীকার কর্‌তে পার্‌ব না। তা না থাক্‌লে ভগবানের নিয়মে তাদের হাতে এত শক্তি কখনও আসতে পার্‌ত না। ভগবানের ব্যবস্থায়, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুকে, ফাঁকিতে কিছু হয় না। যাতে হয় সেটা হচ্ছে পুরুষকার। চরিত্রবল পুরুষকারের

অন্তঃশক্তিস্বরূপ। শুধু জ্ঞান, বিজ্ঞান, এত শক্তিই নয়; কারণ ওগুলোত শক্তির উপাদান মাত্র, ওগুলোকে হজম করে নিজস্ব করতে হলে চরিত্রবল ছাড়া হওয়ার উপায় নাই। কাযেই আমি যে scheme অবলম্বন করতে বলি সেটা হচ্ছে scheme of super-co-operation বা Co-operation by transcendence. অর্থাৎ দেশ হিতকর অনুষ্ঠানের এমন বন্দোবস্ত দেশের লোকের তরফ থেকে করতে চেষ্টা করা, যাতে সরকারের ব্যবস্থাকে সর্ব্বদা ছাড়িয়ে যাওয়া যায়। Not to spoil Government Institutions by Non-co-operation but to supersede them by establishing better Institutions by private endeavour, wholly unconnected with Government এই ব্যবস্থায় স্বভাবতঃ সমস্ত শক্তি জনসাধারণের হাতে গিয়ে পড়বে এবং জনসাধারণের শক্তি এত বাড়বে যে সেই শক্তিটাই প্রধান হবে। গবর্ণমেণ্টের বিপুলশক্তি সত্ত্বেও, গবর্ণমেণ্টকে ফেউ হয়ে থাকতে হবে যদি না গবর্ণমেণ্ট প্রজাশক্তিকে অনুসরণ করেন। গবর্ণমেণ্টকে বর্জ্জন করে তাকে হীনবল করা চলবে না, গবর্ণমেণ্টের শক্তির চেয়ে দেশের হিত করবার শক্তি অধিকভাবে সঞ্চয় করতে পারলে তবেই হবে যথার্থ ভাবে সরকারের পরাজয়। Do not destroy any Institutions but build new and better ones. এই আত্মযোগিতার পন্থা আমার কাছে খুব সম্ভব এবং সুসাধ্য বলে মনে হয়, তবে এ উপায়ে ১বৎসরের মধ্যে স্বরাজ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমাদের যে যে দিকে অভাব তার নির্ণয় করে তার মধ্যে যে গুলা সুসাধ্য সেই গুলোকে প্রথম হাতে নিয়ে যথাবিহিতরূপে সুবন্দোবস্তে

কাজ আরম্ভ করলে আমার মনে হয় এ পন্থায় খুব সুফল হতে পারে। অল্পগণ্ডীর মধ্যে প্রথম experiment আরম্ভ করা চলতে পারে। শুধু দৃষ্টান্ত দেবার জন্য বলছি, এই যেমন ধরুন চাটগাঁয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ভার হাতে নিয়ে local voluntary tax system এ আয় সংগ্রহ করে বেশ সুবন্দোবস্ত করে উৎসাহী যুবকদের ঐ কাজে লাগিয়ে দিয়ে নানা কেন্দ্রে বিদ্যালয় খোলা যেতে পারে। যদি দেশের প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা গবর্ণমেণ্ট থেকে পৃথক ভাবে গবর্ণমেণ্টের চেয়ে ভালভাবে দেশের সেবা করতে পারি, তবে তার যতটুকু পরিমাণে সফলতা আমরা দেখাতে পারব ততটুকু পরিমাণেই স্বরাজ সাফল্য লাভ করবে। মাথা গরম করে হৈ চৈ করে রাসীকৃত বস্ত্রদগ্ধ করলে বা চাকরি ছেড়ে দিলে কি আরও নূতন রকমের আজগুবি কিছু করলে যে খুব সুফল হবে একথা আমার কিছুতেই মনে হয় না। গত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করলে বর্ত্তমান আন্দোলনের এই বিশেষত্ব দেখছি যে খলিফৎ অবলম্বন করে মুসলমান এবং হিন্দু গবর্ণমেণ্ট বিদ্বেষে সমভাবে যোগ দিয়েছে নতুবা অন্যগুলো যথা কাপড় পোড়ান, স্কুল কলেজ অল্পদিনের জন্য পরিত্যাগ দুই একজনের চাকরীত্যাগ বেওয়ারিশী রকমের জাতীয় বিদ্যালয় খোলা, নেশনাল ফাণ্ডতোলা (গতবারের সে টাকাগুলোর পরে আর কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না, এবারের টাকাগুলোর কি পাত্তা হয় দেখলে বুঝব বার ভূতে শুষে না মেরে দেয়!) স্কন্ধে স্বদেশীবস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ইত্যাদি সুললিত সঙ্গীত ছোটখাট ধর্ম্মঘট ইত্যাদি গত বারেও ছিল। আমাদের * * যতদূর মনে পড়ে সেবারেও কলেজ ছেড়ে একটা দৌড় দিয়েছিলেন। এই যে খলিফৎ

অবলম্বনে মুসলমানের সহিত একতাসঙ্ঘটনের চেষ্টা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর মনে হয় এর দূর পরিমাণ ঠিক্ উল্টা। মুসলমানের সঙ্গে যে আমাদের স্বভাবতঃ তেমন মিল নেই, তার একটা প্রধান কারণ এই যে মুসলমান মনে করেন যে তিনি বিরাট মুসলমান জগতের অংশ—first a Mahomedan then an Indian, কাযেই মুসলমানতার কাছে জাতীয়তা বরাবরই তাঁদের কাছে ছোট, এই জন্যই হিন্দুর সঙ্গে বিচ্ছেদটা তাঁদের পক্ষে এত সহজেই ঘটে থাকে, যে হিন্দু মুসলমানকে এক করতে চেষ্টা করবে তার প্রধান কাজ হওয়া উচিত এই Pan-Islamic feeling এর বেগ মন্দীভূত করা। যতই এই Pan-Islamic feeling বাড়বে ততই যথার্থভাবে হিন্দুর থেকে মুসলমান দূরে গিয়ে পড়বেন। সেই জন্য আমার মনে হয় যে মহাত্মা গান্ধির ব্যবস্থায় Pan-Islamic বুদ্ধিতে এত ইন্ধন যোগান হয়েছে, যে ভিতরের দিক্ থেকে হিন্দুর কাছে থেকে মুসলমান অনেক দূরে গিয়ে পড়েছেন, যেটুকু বাহিরের ঐক্য প্রকাশ পাচ্ছে সেটুকু শুধু ইংরাজ বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদ্বেষের উপর ভর করে যে ঐক্য ঘটে সে ঐক্য ঐক্যই নয়। এ আন্দোলনে যতটুকু definite constructive সফল হবে সেই টুকুকেই আমি উন্নতি বলব বাকীটার অনেক খানিকেই So many calories of heat generated and wasted বলে হিসেবে লিখে রাখব।

একথা খুবঠিক যে আমাদের মেজাজ এদের চেয়ে অনেক নরম রকমের, কিন্তু একথাও ঠিক যে য়ুরোপে যে সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যা উঠ্‌ছে, আমাদের দেশে তা ওঠে নি। এত বড় যুদ্ধ হয়েছে, তাতে এরা ক্লান্ত হয়েছে, হবারইত কথা, আমরা হলে ধ্বংশ পেতুম।

কিন্তু ক্ষয় যেমন এদের আক্রমণ করচে, ক্ষয়কে সহ্য করা এবং উপচয় আহরণ করা এদের পক্ষে তেম্‌নি সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ। বর্ত্তমান বাঙালীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কোন্‌খানে তা আমি আজও ভাল করে ঠাহর করতে পারি নি, আপনি যদি পেরে থাকেন ত জানাবেন। প্রাচীন শাস্ত্রপন্থার দিকে চেয়ে দেখি যে প্রথমকার কথা ছিল খাঁটি মানুষ হওয়া, তার পরে যারা আরও উচ্চ অধিকার চাইতেন তাঁরা উচ্চ আধ্যাত্মিকতার পথ অবলম্বন করতেন। অতি স্বল্প লোকেই সে পথ অবলম্বন করবার অধিকার পেত। এই শেষোক্ত উত্তমাধিকারীর সাম্‌নে যে উন্নত আদর্শ ভারতবর্ষ আপনার কাছে ধরেছিল যাতে সমস্ত মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের সঙ্গে মৈত্রী করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারত এইটিই সর্ব্বকালের সর্ব্বজাতির উপর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু এ পন্থা কোনও দিনই সকল লোকে ধরত না এখনও ধরবে না। বাকী সর্ব্বসাধারণের কাছে যে আদর্শ ছিল সেটা ত সব দেশেই সমান। সেই Jesus এর ধর্ম্মের চেয়ে দুই এক পরদা নীচে। কিন্তু অন্য জাতির সঙ্গে তুলনা করলে আমরা কি বলতে পারি যে আমাদের জনসাধারণ অর্থাৎ আপনি ও আমি এই নীচের পরদাতে যেটুকু আয়ত্ত করা প্রয়োজন সেটুকু অন্য জাতির লোক অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিজস্ব করেছি। অন্যজাতির লোক অপেক্ষা আমরা কি বেশী সত্যপ্রিয়, বেশী জিতেন্দ্রিয়, কম পরশ্রীকাতর, কম নীচ। Take facts as facts। ধূয়াগুলো ছেড়ে দিয়ে ভেবে দেখুন দেখি সত্যসত্যই বর্ত্তমান বাঙলা দেশে আপনি আমাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কিছু monopoly দেখতে পাচ্ছেন কিনা? আপনি

ভগবানে বিশ্বাস করেন কি না জানি না, আমি করি। এ কথা কখনও মনে কর্‌বেন না যে ভগবানের ব্যবস্থায় ইংরেজ যে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রভুত্বে শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছে এটা accident, কখনও নয়, নয়, নয়। আমাদের যে শুধু science এ দেশ থেকে নিতে হবে তা নয়, যে স্বভাবের গুণে এরা এমন শক্তি সঞ্চয় কর্‌তে পেরেছে, সেই স্বভাব অর্জ্জন কর্‌তে হবে। প্রাচীন ঋষি আর তপোবল ও সব মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে আউড়ে সমস্ত দোষত্রুটি ধুলোচাপা দিতে পারেন কিন্তু দূর কর্‌তে পার্‌বেন না। শক্তি সঞ্চয় না কর্‌তে পার্‌লে আর্য্যঋষিদের মৈত্রীমন্ত্রের দোহাই দিয়ে ঘৃণার বীজের রোপন কর্‌লে কখনই দেশ উদ্ধার হবে না, একথা নিশ্চয়।

যে যে দিকে আমাদের ত্রুটি, আমাদের জাতিভেদ আমাদের শিক্ষার অভাব, আমাদের দৃঢ়তার অভাব, একএকটি করে সমস্ত অপরাধ ও ত্রুটি বর্জ্জন করে যদি দেশ সেবার নূতন নূতন বন্দোবস্ত কর্‌তে পারি তা হলে হয় আমাদের দেশস্থ ইংরেজকে সেই কাজে আমাদের সহায় হতে হবে নয় সে একেবারে back number হয়ে যাবে, এবং সে থাকুক কি নাই থাকুক আমাদের স্বরাজ হবে। সাময়িক উত্তেজনা মন্ত্রের স্থান অধিকার করে অনেক অনাসৃষ্টি ব্যাপার ঘটাতে পারে, কিন্তু যথার্থ বল সঞ্চয় কর্‌তে হলে ধীরে ধীরে দুগ্ধ পান করে বিন্দু বিন্দু করে রক্ত সঞ্চয় কর্‌তে হবে, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়। উত্তেজনার পথ পথই নয়। শুধু এইজন্যই অনেক সদিচ্ছা, অনেক ত্যাগ সত্ত্বেও non-co operation পন্থা সিদ্ধিলাভ কর্‌বেনা।

শান্তিনিকেতনে পৃথিবীর লোককে পড়ুয়া করে নিতে চাচ্ছেন, বেশ কথা—কি পড়াবেন?

ভারতবর্ষের তরফ থেকে য়ুরোপের কাছে যদি কিছু ধর্‌তে পারা যায় সে, (আমি যতদূর বুঝি) হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রাচীন দর্শন শাস্ত্র। তার মধ্যেও অনেক রদ্দি বাজে জিনিষ আছে; এবং তাকে উদ্‌ঘাটন কর্‌তে হলেও বর্ত্তমান য়ুরোপীয় দর্শনের সম্যক্‌জ্ঞানও সমস্ত সংস্কৃত দর্শন নখাগ্রে আছে এমন লোকের প্রয়োজন, সে লোক ত চোখে দেখতে পাচ্ছি না। আর এক যৎকিঞ্চিৎ হতে পারে Indian art, আচার্য্য বসু মহাশয়ের নিজের আবিষ্কার বিষয়ে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা অবশ্য তাঁর কাছে শিখতে যেতে পারেন। আর যে আপনারা কি শিখাবেন তাত আমি ঠাহর কর্‌তে পারি না। পরমহংসদেবের গল্প মনে পড়ে "তুমি আগে বোঝ" কবে যে আমাদের লম্বা লম্বা কথাটা কমে এসে সেটা কাজে পরিণত হবে তাই কেবল ভাবি।

"যায় যাবে জীবন চলে" এ গান শুনতে বেশ লাগে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় যে হাঁ তাত যাবেই, মেলেরিয়ায়, কালাজ্বরে, বসন্তে, কলেরায় যায় যাবে জীবন চলে, আর সকলে বোসে বোসে গান কর নয় তাস খেল। কথার বাহুল্য ও ভাবের বাহুল্য কমিয়ে আলস্যকে দূর করে সত্যি সত্যি কাযে কবে লাগব তাই ভাবছি; পূর্ব্বের চেয়ে একটু উন্নতি যে না দেখচি তা নয়, কিন্তু এত নিরর্থক ধোঁয়া বালির সৃষ্টি হয়ে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হচ্ছে যে কাজ এগিয়েও যেন এগুচ্ছে না। অথচ কথা গুলো যেন পূর্ব্বের চেয়েও লম্বা লম্বা হয়ে চলেছে। "প্রেয়কে পরিত্যাগ করে প্রাচ্যজাতির শ্রেয়কে বরণ" "ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা ও য়ুরোপের ভোগকলুষতা" এ সব শুনে শুনে কান

ঝালাপালা হয়ে গেল। অথচ একটা লোকের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখিনা যে সে কোন্‌খানে তার আধ্যাত্মিক উত্তুঙ্গ শিখরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অনেক কথা বল্‌বার ছিল, কিন্তু চিঠিটা বেজায় রকমের লম্বা হয়েছে, আর অন্য কথায় ঢুকলে সে Penel সাহেবের রায় হয়ে উঠবে। রাতও ঢের হয়েছে, কাযেই এই বারে ইতি দিতে হবে।

জাতিভেদ সম্বন্ধে আমি বড় খোঁজ রাখি না। তবে Bonglóর Essais sur le regime des castes ও Senart এর Les castes dans l'Inde les faits et le système এই দুখানা ত আপনি নিশ্চয়ই পড়েছেন। শুনে সুখী হবেন Mind পত্রিকা আমাকে তাদের দর্শন গ্রন্থের সমালোচকরূপে নিয়োগ করেছেন। এটা একটু বিশেষ খাতির করেছে বলেই ত মনে করি।

ভবদীয়—

বেদুঈন

—:*:—

কণ্ঠে যদি পেতাম আমি
রুদ্রদেবের তানখানিরে
গেতাম তবে এম্‌নিতর গান
ডম্বরুতে তাল লাগায়ে
আঁকড়ে-ধরা কোনখানিরে
ভাসিয়ে দিতাম এম্‌নি ডেকে বান,
সাত সাগরের ঊর্ম্মি এনে
ঘূর্ণিপাকের চক্রতলে
নক্রে যত দিতাম আমন্ত্রন
জন্ম-ব্যাপী অপমানে
ডুক্‌রে-কাঁদা অশ্রুজলে
হৃদয় ছিঁড়ে দিতাম বিসর্জ্জন।

চাই কি আজি? চাই যে ওরে
স্তব্ধ মূকের কণ্ঠ ছিঁড়ি
উঠবে বেজে ক্রুদ্ধ কলরোল

বহ্নি জ্বালি' ফিন্‌কি তারি
হৃদয় তনু চিরি চিরি
তুল্‌বে আজি প্রলয়-কাড়ার বোল ;
ললিত রাগে বন্ধ আঁখি
অন্ধ কোথা থাকুক পড়ে,'
দিকে দিকে রুদ্র সাহানায়
কঠোর আঘাত নিঠুর হ'য়ে
পড়ুক আজি বাইরে ঘরে
পাগল করুক জীবন দুরাশায় !

ওই যে ঘরে একলা পড়ে'
কোন্ বা সুখের স্বপ্ন-দেখা
কোন্ অলীকের প্রলেপ-দেওয়া চোখে
ওই যে কোনে প্রলাপ-ঘেরা
স্বর্গ-সুখের মন্ত্র-শেখা
করছে জমা অশ্রু দুখে শোকে,
দন্তোলিরই এক নিনাদে
করুক সবায় ক্রুদ্ধ আঁখি,
শিষ্ট প্রাণের সকল আরাম-রাগ
দীর্ণ করে' পিষ্ট করে'
বজ্র-বাণী যাক্‌রে আঁকি
"জাগরে অচল জাগরে অলস জাগ !"

বিশ্ব-ব্যাপী মৃত্যু জাগে
সিন্ধু বুকের ঊর্ম্মিরাশি
রক্তে ঘিরি কর্‌লে লালে লাল,
কোনখানে তুই নদীর বাঁকে
বাজাস্ আপন খেলার বাঁশী
তুলিস্ আপন খেলার নায়ের পাল ;
লাগবে কি তোর পালে হাওয়া
হবে কি তোর সাগর যাওয়া
শেষ হবে কি কোনের আনাগোনা
বেহিসাবীর নৃত্য বুকে
বিশ্বে রে ছাড়-পত্র-পাওয়া
মন্ত্র গুণে কর্‌বি তামা সোনা ।

জাগে জাগে আজ যে জাগে
—বক্ষ-শোণিত সঙ্গে জাগে—
আদিম কালের আরব-বেদুঈন,—
অপার মরুভূমির মাঝে
কঠিন সুরের কঠোর রাগে
ভাঙ্‌বে আজি হৃদয়-কারা দীন ;
তপ্ত মরুর বক্ষ-বালি
উড়্‌বে আজি অশ্ব-খুরে
কাল-বোশেখীর ক্রুদ্ধ যেন শ্বাসে

দিগন্তে দিক-চক্রবালে
ফিরবে আঁখি দূরে দূরে
দুর্গমেরে সহজ করার আশে।

জাগে জাগে আজ যে জাগে
—বক্ষ-শোণিত সঙ্গে জাগে—
চিরন্তনের আরব-বেদুঈন
উড়ুছে ধূলি বর্শা তুলি
যায় কি গাওয়া বেহাগ-রাগে
নির্ব্বাসিত কর্‌রে রবাব বীণ :—
ডাক রে আজি
ভাঙ্‌বে অপমানের পেশা
বিশ্ব-ব্যাপী কণ্ঠ-ছেঁড়া হাঁকে
বক্ষ-শোণিত তালে তালে
লাগবে আজি রুদ্র-ন
জীবন-গানের মৃত্যু ফাঁকে ফাঁকে।

জাগে জাগে আজ যে জাগে—
—বক্ষ-শোণিত সঙ্গে জাগে—
মুক্ত পাগল আরব-বেদুঈন

আর না চাহি প্রতিদিনের
সঙ্গোপনের অশ্রু-রাগে
কণ্ঠ যেথা গায় রে মৃদু ক্ষীণ ;
ছিন্ন করে' দীর্ণ করে'
ছোট্ট মনের মায়া-বাঁধন
ঘিরবে অসীম মরুভূমির মায়া।
আশার যত ছোট্ট ভাষা
পড়্‌বে লুটে মৃত্যু কাঁদন,
—প্রাণের পাশে দিগন্তরের ছায়া।

জাগে জাগে আজ যে জাগে
—বক্ষ-শোণিত সঙ্গে জাগে
জীবন উষার আরব-বেদুঈন
ওই যে আঁধার পড়্‌ছে খসে'
ফুল্ল মনের অরুণ-রাগে
টুট্‌বে আজি যুগান্তরের ঋণ :—
আজ যে সাগর পারে-পারে
প্রাণের ভাষা কল্লোলিত
উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত মন

আজ যে দিকে দিগন্তরে
ছোটার হাওয়া হিল্লোলিত
জীবন আজি কর্‌বে মরণ-পণ।

শারদীয়া সপ্তমী
১৩২৮

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উড়ো-চিঠি

—:০:—

১লা নভেম্বর, ১৯২১।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সতের বছর বয়েসে এবার আপনার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। আপনি এখন আপনার ছেলের ভবিষ্যত শিক্ষার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন—এবং সে সম্বন্ধে ভাবতে সুরু করেছেন। এ বিষয়টি আপনার কাছে বিশেষ করে উল্লেখ করবার মানে হচ্ছে এই যে বাংলাদেশে ও একটী সাধারণ ব্যাপার মোটেই নয়। এতকাল পর্য্যন্ত বাংলা দেশের পিতারা তাঁদের ছেলেদের বাঁধা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকা সড়কের একদিক দিয়ে ঢুকিয়ে আর একদিক দিয়ে বের করে' আনবার মধ্যে আর কোন চিন্তার প্রয়োজন দেখতেন না। ও-ব্যাপারটীর মধ্যে তাঁদের আশার স্বপ্ন এত বড় হয়ে থাকত যে আশঙ্কার লেশ-মাত্র তাতে স্পর্শ করতে পেত না। ছেলেকে কলেজে ঢুকিয়ে হয় Law নয় medicine নয় civil service ঘুরিয়ে আনা—এই বাঁধিগৎ যে আজ আপনি মানছেন না এতে করে মনে হচ্ছে দেশের হাওয়া বদ্‌লেছে। বাংলা দেশের সব পিতারাই যদি আপনার মতো আপন আপন ছেলের শিক্ষা-সম্বন্ধে সচেতন হন ও ভাবতে সুরু করেন তবে আমার বিশ্বাস বিশ বছরে বাঙালী-সমাজের চেহারা বদ্‌লে যাবে। বলা বাহুল্য আপন ছেলের শিক্ষা-সম্বন্ধে আপনার এই সজাগ অবস্থা সামজ-হিতৈষী মাত্রকেই

আনন্দ দেবে। আমি ভেবে চিন্তেই এখানে সমাজ-হিতৈষীর জায়গায় স্বদেশ-হিতৈষী কথাটা ব্যবহার করি নি। কেননা স্বদেশ কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পলিটিক্সের পালে হাওয়া লাগাই। কিন্তু এই কথাটা আজ আমাদের সদা সর্ব্বদা স্পষ্ট করে' মনে রাখতে হবে যে পলিটিক্স শিক্ষার অঙ্গীভূত হলেও শিক্ষা পলিটিক্সের অঙ্গীভূত নয়। কেননা পলিটিক্স মানুষের জীবন-যাত্রার একটা দিক কিন্তু শিক্ষা-ব্যাপারটা মানুষের মনের সব দিক নিয়ে। কাজেই ওটার চাইতে এটা বড়। বিশেষতঃ শিক্ষাই মানুষ গড়ে—আর ধর্ম্মনীতি বলুন সমাজনীতি বলুন রাজনীতি বলুন, সাহিত্য দর্শন আর্ট বিজ্ঞান বলুন গড়ে তোলে এই মানুষ। জাতির যা কিছু সৃষ্টি তা দু'ভাগে পড়ে। তার একভাগে প্রয়োজনের সৃষ্টি আর এক ভাগে আনন্দের সৃষ্টি। এর দুয়ের পিছনেই দরকার ঐ মানুষ। আর ঐ মানুষ গড়বার যন্ত্র ও মন্ত্র হচ্ছে শিক্ষা। এই শিক্ষাকে পলিটিক্সের চশমার ভিতর দিয়ে দেখলে তা হয় acute নয় obtuse দেখাবেই। কেননা পলিটিক্সের লোভ নগদ বিদায়ের উপর সুতরাং ওর লাভ সাময়িক। বাঙালী ব্যবসাদারেরা যেমন রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় প্রথম প্রথম প্রচুর লাভ খেয়ে তারপর ফেল মারে, পোলিটিক্যাল বিদ্যাপিঠগুলোরও তেমনি দশা হবারই বেশী সম্ভাবনা। শিক্ষাকে দাঁড় করাতে হবে আত্ম-অনুশীলনীর উপর পলিটিক্স-পরিচর্চ্চার উপরে নয়। এ কথাটা আপনাকে এত করে বল্‌বার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আমাদের ১৯০৬ সালের জাতীয়-শিক্ষা পরিষদ কিম্বা ১৯২১ সালের কলিকাতা বিদ্যাপীঠ দুয়েরই জন্ম পলিটিক্সের তাগিদের ভিতর। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ আমরা

সফল করে' তুলতে পারি নি—আজকার কলিকাতা বিদ্যাপীঠই যে সফল হবে তেমন আমার মনে হয় না। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখবেন যে কলিকাতা বিদ্যাপীঠ সফলও যদি হয় তবেই যে আমাদের শিক্ষা সমস্যাটা নিঃশেষে মুছে যাবে তা নয়। চোখের সাম্‌নেই দেখতে পাচ্ছেন যে-সব দেশে গভর্ণমেণ্ট দেশের লোকের হাতে সে সব দেশেও শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকের মাথা ঘামান' থামে নি। আসলে গভর্ণমেণ্টকে পদে পদে জব্দ করতে হবে বলেই যে আজ আপনার মনে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে এ কথা সত্য নয়—অন্তত সত্য হওয়া উচিত নয়। এ কথা বোধ হয় আমি আপনাকে নির্ব্বিঘ্নে জোর করে বলতে পারি যে যতদিন না এ প্রশ্ন সত্যিকার করে' জাতির নিগূঢ়তম অন্তর থেকে উঠবে ততদিন এর সমাধানও হবার কোন সম্ভাবনা জন্মাবে না। একমাত্র আমাদের অন্তরের সত্যই বাইরের বাধা বিঘ্নকে জয় করতে পার্‌বে—এবং সেই সত্যই কেবল আমাদের সামর্থ্য দান করতে পারবে।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যে সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত এ-রকম কথা আমি আপনাকে কোন দিনই বলি নি। কিন্তু আমার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে এই যে পরের দোষ বের করার আগে নিজের কোন ত্রুটী আছে কি না সেইটে আবিষ্কার করা। কেননা আমার বিশ্বাস সফলতা অসফলতার প্রধান কারণটা এইখানে। নিজেদের ত্রুটী না ঝেড়ে ফেল্‌লে বাইরের গলদকে আমরা কোনদিনই এড়িয়ে চল্‌তে পার্‌ব না।

আপনি বলেছিলেন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা ছেলেদের শিক্ষা দেন না, দেন কতকগুলো নোট গিলিয়ে

যাতে ক'রে তারা এগ্‌জামিন পাশ করতে পারে। কিন্তু তবে দেখুন বাঙালী ছেলের অভিভাবকেরা কি ঠিক ঐটেই এতকাল ধরে চেয়ে আসেন নি? তাঁদের দৃষ্টি কি ছেলেদের শিক্ষার চাইতে class promotion এর দিকেই বেশী আবদ্ধ ছিল না? হাজারে ন' শ' নিরানব্বুই জন অভিভাবকের মনের দিকে তাকিয়ে দেখুন দেখতে পাবেন সেখানে ছেলে কটা পাশ দিয়েছে তার হিসেব আর কোন হিসেব নেই। এই যে পাশের হিসেব এ কেন? কেননা আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে বিদ্যার আলয় বলে' দেখিনি, দেখেছি সেটাকে অর্থোপার্জ্জনের উপায় বলে'। বাংলার কত কত বাপ যে না খেয়ে না পরে' কর্জ্জ করে' ছেলের বি, এ, এম, এ, পড়ার খরচ যুগিয়েছেন সে কি কেবল ছেলেকে সুশিক্ষিত করবার ঐকান্তিক ও অহেতুক ইচ্ছায়? শিক্ষার প্রতি এ-রকম অহেতুক অনুরাগ আমাদের থাকলে আমাদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধান বহুপূর্ব্বে হ'য়ে যেত। কিন্তু তাত নয়—বি, এ এম, এ পাশ করাবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থোপার্জ্জনের পন্থা বেশী সুগম করা। আমার ভয় হয়, আজ যে আমরা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষালয়ের উপরে বিরূপ হয়েছি সেটা সেখান থেকে শিক্ষা পাচ্ছি না বলে ততটা নয় যতটা সেখান থেকে বি, এ এম, এ পাশ করে' বেরুলেও আর তেমন অর্থোপার্জ্জনের সুসার হয় না বলে'। আমার এ-কথা যে সত্যি তার প্রমান কি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদে কি কলিকাতা-বিদ্যাপীঠে গেলেই দেখতে পাবেন। ও দুই অনুষ্ঠানের Technical Branch ও Medical Line এ যত ছেলে ভর্ত্তি হয়েছে General Line এ তার অর্দ্ধেকেরও অর্দ্ধেক হয় নি।

একথা আমি কিন্তু বল্‌ছি না যে খাওয়া পরা সম্বন্ধে সবাই দৃষ্টিহীন হবে বা হওয়া সম্ভব। কিন্তু সমগ্র সমাজের দৃষ্টি যদি কেবল মাত্র খাওয়া পরার উপরেই নিবদ্ধ হয় তবে একদিন যেমন আর্য্যেরা ভেড়া তাড়াতে তাড়াতে মধ্য আসিয়া থেকে এ দেশে এসেছিলেন তেম্‌নি আবার একদিন আমাদের ঐ ভেড়া তাড়াতে তাড়াতে খাসিয়া পাহাড়ের দিকে প্রস্থান করতে হবে। আর সেটা নিশ্চয়ই মহা-প্রস্থান বলে' গণ্য করা চল্‌বে না। আদিম মানুষ কি করত জানি নে কিন্তু আজকের মানুষ cannot live by bread alone কথাটা বিলিতি হলেও সত্যি। সত্যাগ্রহের তোড়ে কথাটাকে উড়িয়ে দেওয়া চল্‌বে না।

কিন্তু সে যা হোক্ এই যে আমাদের অভিভাবকমণ্ডলীর চাওয়া যে তাঁদের ছেলেরা যত শীঘ্র সম্ভব ডিপ্লোমা নিয়ে Law হোক্ Medicine হোক প্রফেসরী হোক্ যে কোন পথে অর্থোপার্জ্জনে লেগে যাক্, আপনি কি জোর করে বল্‌তে পারেন যে এই চাওয়া বাংলা দেশের শিক্ষক ও অধ্যাপকদের উপরে কোনই প্রভাব বিস্তার করে নি? আপনি কি জোর করে কল্‌তে পারেন যে এই চাওয়ার তাগিদ্ তাঁদের শিক্ষকতা ও অধ্যাপনাকে তদনুরূপ একটা বিশেষ ভঙ্গি ও গতি দেবার এতটুকুমাত্র সাহায্য করে নি? আমরা মনে চিন্তা করেছি এক আর আজ মুখে ফল চাচ্ছি আর এক। মনের কথার চাইতে মুখের কথা বড় মানুষের আইন আদালতের কারখানায় হ'তে পারে কিন্তু সৃষ্টির মন্দিরে নয় এবং তা কোনদিন হবারও সম্ভাবনাটুকু পর্য্যন্ত নেই।

আসলে আপনাদের School of Thoughts এর সঙ্গে আমাদের School of Thoughts এর তর্ক ঠিক এইখানটায়। আমরা

বল্‌ছি ও চিরকাল বল্‌ব যে যা আমরা মনে সত্যি করে' চাই নি ও ভাবিনি তা বাইরে সফল করে' তুল্‌বার আশা করা অন্যায়। এবং আশা কর্‌লেই তা সফল হবে না। মনে যে কোন চিন্তা উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটার বস্তুবিশ্বে রূপ দেবার শক্তি সংগৃহীত হয়ে যেত যদি তবে সেটা মানুষের পক্ষে বর হত না অভিশাপ হত তা বলা মুস্কিল। কিন্তু বর্ত্তমান সৃষ্টির সত্যটা এই যে সে শক্তি সংগৃহীত হয় না। আপনারা মনকে অস্বীকার না করলেও বাইরের উপরে বেশী ঝোঁক দেন আমরা বাহিরকে লোপ করতে চাইনে কিন্তু মনের চিন্তার মনের ইচ্ছার এমন একটা ভিত্তি গড়ে' তুলতে চাই যা হিমাদ্রির মতো হবে অটল অচল এবং সিন্ধুর মতো হবে সদা জাগ্রত তবেই তা আপনাকে সফল করে' তুলতে পারবে সকল বাধা সকল বিঘ্ন অতিক্রম করে'—তবেই তা বাইরের প্রতিকূল শক্তিকে বিধ্বস্ত করে' জয়লাভ করতে পারবে।

মানুষের এই যে চিন্তার ও ইচ্ছার শক্তি তা লাভ হতে পারে মনকে বিক্ষিপ্ত করে নয় মনকে সংহত ক'রে। বাঙালীর মন এম্‌নিই তরল অর্থাৎ flexible সে-মন সহসা জমাট বাঁধে না। এটা যেমন একদিকে গুণের তেমনি আর একদিকে দোষের। গুণের এই দিক থেকে যে এমন মনে গোঁড়ামি বলে' পদার্থটা সহসা কায়েমী হ'তে পারে না। এমন মনের বিশ্ব-মনের সঙ্গে সংযোগ ও সম্বন্ধ সহজে স্থাপিত হ'য়ে যায়। এটা জাতির পক্ষে একটা মহা লাভ। এতে করে' জাতি তার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে' আপনাকে একটা বৃহত্তর জগতে অনুভব করতে পারে। আর এটা আপনি নিশ্চয়ই মানেন যে সংকীর্ণতারই আর এক নাম মৃত্যু। জাতীয় বৈশিষ্ট্যই বলুন

আর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যই বলুন তা বাঁচিয়ে রাখ্‌বার অর্থাৎ তার জীবনী-শক্তি রক্ষা কর্‌বার সহজ ও একমাত্র উপায় হচ্ছে বিশ্ব-মনের সঙ্গে তার সংযোগ রক্ষা করে' করে' চলা। বাঙালী মনের ঐ flexibilityর জন্যে বাঙালী পরের মনের জিনিস সহজে গ্রহণ করতে হজম করতে পারে। ঐ কারণে পাশ্চাত্যের সাহিত্য আমাদের মনকে যেমন সত্যিকার দোলা দিয়েছে যেমন সত্যিকার করে' অনুপ্রাণিত করেছে ভারতের আর কোন প্রদেশবাসীর তেমন করে নি। অথচ বাঙালী যে সবাই ইয়োরোপীয়ান বনে' যায় নি তা ত চোখেই দেখা যায়। যে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে আমরা অনেকে ফৈরঙ্গ সাহিত্য বলি, আমরা ভুলে যাই যে সেই রবীন্দ্রনাথের গানে গল্পে কবিতায় বাঙালী-মনের রূপ ও ছবি যেমন করে' আছে তেমন কিন্তু আর কোন বাঙালী কবির কাব্যে নেই।

লয়ে রসারসি করি কশাকশি
পোঁটলা পুঁটলি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে
গৃহিণী কহিল কাঁদি'
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে লয়ে
কষ্ট অনেক হবে"

কিম্বা—

আমসত্ত্ব আমচুর ; সের দুই দুধ ;
এই সব শিশি কৌটা ওষুধ বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে
মাথা খাও ভুলিও না খেয়ো মনে করে'।

কিম্বা—

কহিলাম ধীরে
"তবে আসি।" অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি'
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

এ যে ফারসীও নয় ফরাসীও নয় এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই দু'মত হবার সম্ভাবনা নেই।

তারপর—

গ্রামপথ হতে প্রভাত আলোতে
উড়িছে গোখুর ধূলি
উছলিত ঘট বেড়ি কটি তট
চলিয়াছে বধূগুলি
তোমার কাঁকন বাজে ঘন ঘন
দুইদিন পরে দ্বিতীয় প্রহরে প্রবেশিনু নিজগ্রামে
কুমোরের বাড়ী দক্ষিণে ছাড়ি রথতলা করি বামে
রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা মন্দির করি পাছে

এ যে বাংলারই ছবি এ সম্বন্ধেও নিশ্চয় কারো ভুল করবার কোন সম্ভাবনা নেই। আর এ রকম রাশি রাশি তোলা যায়।

তবে রবীন্দ্রনাথে ওর অতিরিক্ত একটা জিনিস আছে যা আসলে প্রাচ্যেরও নয় পাশ্চাত্যেরও নয়—অথচ যে দখলি-স্বত্ব সাব্যস্ত করতে পারে তারই। এই জিনিসটা হচ্ছে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের প্রতিদিনকার কর্ম্ম চিন্তা আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করে' যে একটা চিদাকাশই বলুন বা হৃদাকাশই বলুন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়কেই

আলিঙ্গন করে' আছে সেই আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেলা ও কাব্যে সেইখানকার সুর ছবি ও রস জাগিয়ে তোলা। বলা বাহুল্য সে-সুর সে-রস সে-ছবিতে মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের কোনই সুবিধা হয় না কিন্তু তাতে মানুষের মধ্যেকার এমন একটা জিনিসের রসদ থাকে যে জিনিসটী শুকিয়ে গেলে মানুষ Eat and Drink and be damn'd অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আপনার স্ত্রীকে সেদিন "যেতে নাহি দিব" কবিতাটী পড়ে শোনাচ্ছিলুম। সামান্য কিন্তু অতি সকরুণ বাঙালী পরিবারের একটী ঘটনা। পিতা বিদেশে চলেছেন। পোঁটলা পুঁটলি বাক্স তোরঙ্গ সব সাজিয়ে গুছিয়ে বেরুবার সময় তিনি তাঁর চার বছরের মেয়ের কাছে বিদায় নেবেন—মেয়ে হঠাৎ বলে বস্‌ল—"যেতে আমি দিব না তোমায়"।

যেখানে আছিল বসি' রহিল সেথায়
ধরিল না বাহু মোর রুধিল না দ্বার
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকার
প্রচারিল—"যেতে আমি দিবনা তোমায়।"

কিন্তু—

তবুও সময় হ'ল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।

এ অতি সকরুণ! গভীর একটা ব্যথা প্রাণ বিদ্ধ করে' যায়। কিন্তু ঐ ব্যথাই আর কেবল ব্যথা থাকে না যখন দেখি যে কবির দৃষ্টিতে এইটে ধরা পড়েছে যে বাঙালী পরিবারের ঐ ঘটনাটী চার বছর বয়েসের একটী বাঙালী শিশুর ঐ অশ্রু-সজল অধিকার-প্রকাশ

এ বিশ্বে একটা বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়। বিশ্ব-সুরের সঙ্গে ওর সুর বাঁধা। বিশ্ব-সুরেরই ও একটা প্রতিধ্বনি একটী বাঙালী শিশু-কণ্ঠে ফুটে উঠেছে।

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন, "যেতে নাহি দিব"

কবি দেখ্‌তে পেলেন—

তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছেন প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব।"
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব' নিব'
আঁধারের গ্রাস হ'তে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব নারে।"

এ ক্রন্দন-ধ্বনি সারা' বিশ্ব হতে কবি-কর্ণে ধ্বনিত হ'ল

প্রলয় সমুদ্র-বাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্র বাহু জ্বলন্ত আঁখিতে
"দিব না দিব না যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে' তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত্ত কলরবে।

যেন

উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্ম্ম-ভেদি করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠ স্বরে।

এই যে ব্যথা এ ব্যথা যতক্ষণ একটী বাঙালী পরিবারের পারিবারিক মনে আবদ্ধ ছিল ততক্ষণ তা একান্তভাবে ব্যথারূপেই ছিল। কিন্তু সেই ব্যথা সেই ক্রন্দন যখন বিশ্বপটকে perspective করে দেখলুম শুনলুম, তখন এই ব্যথার মধ্যে যে-একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ রয়েছে সেইটের সন্ধান সেইটের অনুভব পেলুম। সংকীর্ণতা যেখানে ব্যথারূপেই আপনাকে সমাপ্ত মনে করেছিল সেখানে নিখিলের স্পর্শ জানিয়ে দিয়ে গেল যে সমাপ্তি ঐ ব্যথায় নয় ব্যথার পিছনে যে আনন্দ আছে সেই আনন্দে। যেখানে স্বার্থদুষ্ট অহঙ্কার গণ্ডী কেবল বেদনাকেই জমা করে' তুলছিল অখণ্ডের সংবাদ সেখানে পুলক-স্পর্শ ছুঁইয়ে গেল।

এখন কি বলতে হবে এ-কবিতাটীর অর্দ্ধেক বঙ্গ আর অর্দ্ধেক ফৈরঙ্গ? এই যে সামান্য থেকে অসামান্যে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে বিশেষ থেকে বিশ্বে চলমান কবির দৃষ্টি এ কি বিশেষ করে' পাশ্চাত্য? তা যদি হয় তবে বল্‌ব যে ঐ পাশ্চাত্যকে স্বীকার করে' আমরা বেঁচে গেছি—এবং আমাদের সাহিত্য new lease of life পেয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। বিশ্বের সঙ্গে কোলাকুলি করাটা প্রাচ্যেরই হোক বা পাশ্চাত্যেরই হোক্ কারও একচেটে নয়।

কিন্তু বলছিলুম বাঙালী মনের flexibility-র কথা। সে-মনের গুণের কথাই আগে উল্লেখ করেছি। কিন্তু ঐ রকম মনের একটা প্রকাণ্ড দোষ আছে। সে দোষটী হচ্ছে এই যে এমন মনকে সহজে জমাট করা যায় না। এমন মনকে সংহত করে' কেন্দ্রীভূত করে' তার সমস্ত শক্তিকে একটা অপ্রতিহত সামর্থ্যের সঙ্গে কোন একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপারের উপরে প্রয়োগ করা যায় না। এইখানেই

বাঙালী চরিত্রের দুর্ব্বলতা। এই কারণেই বাঙালী চরিত্রে ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা অধ্যবসায় প্রভৃতির তেমন সম্ভাব নেই। যার জোরে মানুষ বলে—যা ধর্‌ব তা কর্‌ব—একটা doggedness একটা tenacity of purpose বাঙালী চরিত্রে এর বাহুল্য নিয়ে অভিযোগ করা চলে না। কিন্তু ঐটী না হ'লে মনোজগতে যাই হোক্ কর্ম্মজগতে জীবন-যাত্রার যুদ্ধে বিশ্বের সংগ্রাম-পথে বাঙালীকে পিছিয়ে পড়ে' থাক্‌তেই হবে। বাঙলার সহরে সহরে মাড়োয়ারী গুজরাটীর হর্ম্ম্যাবলী উঠবেই—বাঙালীর পল্লীতে পল্লীতে ভোজপুরী গাজীপুরী জুটবেই। আপনি হয়ত বলবেন যে আমি provincial patriotism প্রচার করছি। কিন্তু আপনাদের কাছেই ত শুনি যে National না হ'লে International চল্‌বে না। সুতরাং ঐ সূত্র অনুসারেই Provincial না হ'লে Interprovincial চল্‌বে না। আমরা বাঙালীরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশকে অবাঙালীদের কাছে mortgage কর্‌তে চাই নে।

সুতরাং বাঙালীর এই তরল মনকে মৃত্যুর মতো rigid না করে' একটা stability দান করতে হবে। তার উপায় কি? তার উপায় যাই হোক্ সেটা নিশ্চয়ই কেবল political agitation নয়। কেননা agitation মাত্রেই মনকে কেবল সংহত করে না তাই নয় তা মনকে সংক্ষুব্ধ করে। আর মন সংক্ষুব্ধ হবার অর্থ মন কেন্দ্রচ্যুত হওয়া। মনকে কেন্দ্রচ্যুত করে' তাকে কেন্দ্রীভূত করা নিশ্চয়ই লজিকের বাইরে।

আসলে আমাদের political agitation এ দেশের political constitution এর যে রদ বদল হয় হোক্ কিন্তু মানুষের মন গঠন

চরিত্র গঠনের জন্য একটা অন্তরের সাধনা চাই। আর এ সাধনা সমষ্টিগত হতে পারে না, এ সাধনা হচ্ছে ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত এই সাধনায় সিদ্ধ না হ'লে আমাদের জাতীয় সব কিছুই লব্ধ হলেও অসিদ্ধ হ'য়ে উঠবে।

যাক্ সে সব কথা। আপনি যখন আপনার ছেলের শিক্ষা সম্বন্ধে ভাবছেন তখন সেই সম্বন্ধে আমার মতামত দু' এক কথা বল্‌ছি।

আমার একটা আদর্শ শিক্ষার আদর্শ আছে। সেটা বল্‌ছি।

আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিশ্চয় আপনি টের পেয়েছেন যে আমি একজন ঘোরতর individualist। এতে মনে করবেন না যে আমি সমাজ মানি নে। সমাজ আমি নিশ্চয় মানি কিন্তু আমি বল্‌তে চাই এই কথা যে সমাজও যে সম্ভব হয়েছে তা ব্যক্তিরই স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্মের গুণে—সমাজের অস্তিত্ব সমাজের প্রতিষ্ঠা ব্যষ্টিরই fulfilment এর উপর। যে সমাজ ব্যষ্টির সার্থক হবার পথে বাধাই সৃষ্টি করে' করে' চলে সে-সমাজের বন্ধন-গ্রন্থি ছিঁড়বেই। আগে ব্যষ্টি তারপর সমষ্টি—আগে unit তারপর unity-ব্যষ্টি যে সামাজিক আইন-কানুনে ধরা দেয় সেই আইন-কানুনের মধ্য দিয়ে ব্যষ্টিরই সত্য-সমষ্টির সার্থকতা হয় বলে'। তাই দেখতে পাই ব্যষ্টির অন্তর-সত্যের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সেই সত্যের তাগিদে সামাজিক গ্রন্থিগুলিও কখনও ডানে কখনও বাঁয়ে সরছে—কোনটা একটু আল্‌গা হচ্ছে—কোন্‌টা আরও কসে' যাচ্ছে—আবার কোন কোনটা হয়ত একেবারেই খুলে পড়ছে।

আমার মনে যে আদর্শ শিক্ষার আদর্শ আছে সেটাও একেবারে individualistic। একটী শিক্ষকের কাছে পঞ্চাশটী ছেলে পড়ুক—

যদি শিক্ষকের পড়াবার যোগ্যতা থাকে—কিন্তু তা একই সুরে এক সূত্র নয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সার্থক করে' তোলা। আপনি নিশ্চয় বলবেন যে কথাটা শুন্‌তে বেশ কিন্তু ওর কোন মানে হয় না—কেননা ওর বিশেষ একটা অর্থ নেই—অর্থাৎ কথাটা vague। কথাটা ঠিক সুতরাং ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

আমি এই কথাটা বিশ্বাস করি যে সুস্থ সবল ও প্রাণবান মানুষের মধ্যে কোন না কোন একটা গুণ আছে, কোন না কোন বিষয়ে তার একটা সহজ প্রেরণা একটা সহজ কুশলতা আছে। প্রত্যেক মানুষটাই এক একটা genius। বুঝতেই পারছেন genius কথাটা আমি এখানে ব্যবহার করছি in its broadest sense possible. এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষের তার ঐ সহজ প্রেরণা সহজ কুশলতার দিকে সচেতন হয়ে ওঠা—অর্থাৎ দু' কথায়—আত্মানং বিদ্ধি।

এই যে আত্ম-জ্ঞান এই আত্ম-জ্ঞানের ফলে আত্মার স্বধর্ম্মের পরিচয় পেয়ে মানুষ সেই অনুসারে আপনার জীবন নিয়ন্ত্রিত করবে আপনার জীবনে তেম্‌নি কর্ম্ম তেম্‌নি ধর্ম্ম বরণ করে' নেবে। একেই আমি আদর্শ শিক্ষা বলি কেননা এতেই মানুষের জীবন সত্যিকার করে' সার্থক হবে সুতরাং আনন্দময় হবে।

এইখানে যে প্রশ্নটী উঠ্‌বে তা জানি। প্রশ্নটী উঠ্‌বে এই যে মানুষের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে সে যা তাকেই ফুটিয়ে ধরা তাকেই সার্থক করে' তোলা তবে Human progress, World's Evolution কথাগুলো কোথায় যায়? শিক্ষার উদ্দেশ্য আসলে আপনাকে অতিক্রম করা নয় কি?

কিন্তু Human progress, World's Evolution কি মানুষের যুগে যুগে নিজেকে অতিক্রম করার ফল? এ অতিক্রম করার মানে কি? এর মানে যদি এই হয় যে মানুষ এক অবস্থা থেকে আজগুবি ভাবে আর একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে ম্যাজিকের দ্বারা তবে আমি বল্‌ব যে মানুষ কোন কালেই আপনাকে অতিক্রম করেনি এবং কোনকালে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বেও না। আর অতিক্রম করার অর্থ যদি এই হয় যে মানুষ তার আপনার মধ্যেই যে সম্ভাবনার বীজ রয়েছে সেই সম্ভাবনারই চরম অভিব্যক্তির দিকে আপনাকে টেনে টেনে চলেছে তাহলে বল্‌ব যে মানুষ প্রতি-মুহূর্ত্তে আপনাকে অতিক্রম কর্‌ছে। আসলে মানুষ তার সভ্যতার প্রসার করেছে আপনাকে অতিক্রম করে' নয়, আপনাকে পরিক্রমণ করে'। বানর আপনাকে অতিক্রম করে' মানুষ হয়েছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে সুতরাং আমার বিশ্বাস ও missing link কোন দিনই পাওয়া যাবে না। আর মানুষ যদি কোন দিন দেবতা হয় তবে তার মানেই হবে এই যে মানুষের মধ্যেই দেবতা হবার সম্ভাবনার বীজ গুপ্ত ছিল।

সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছেন Human progress এর অর্থ মানুষের গুণ সমষ্টির বিকাশ ও প্রসার এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় লম্ফ প্রদান নয়। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষের আপন আপন গুণ ও ধর্ম্মের সুসার ও প্রসার। কেননা আমি আগেই বলেছি আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক সুস্থ ও সবল ও প্রাণবান মানুষের মধ্যে কোন না কোন একটা গুণ আছে যা তার সহজ ধর্ম্ম। প্রত্যেক মানুষের এই গুণের স্বাতন্ত্র্য এম্‌নি, প্রত্যেকের চিন্তাশক্তি

মননশক্তি ধারণশক্তি এম্‌নি আলাদা যে তাদের কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে চল্‌বার তাল আলাদা হতে বাধ্য। এই কারণেই আমার আদর্শ-শিক্ষার আদর্শটী একেবারে individualistic.

কিন্তু আমার এ আদর্শ আজ প্রকাশ করা বা প্রচার করা অনর্থক। কেননা আজ সভ্যজগতের সকল অনুষ্ঠান এমনি যন্ত্রের মতো হয়ে উঠেছে সমাজ নিজেকে এমনি mechanise করে' ফেলেছে যে এমন কি শিক্ষায়ও আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাব্‌তে পারিনে। আমার আশঙ্কা হয় কিছুদিন পরে আমাদের শিক্ষালয়গুলোর ক্লাশে ক্লাশে শিক্ষকের পরিবর্ত্তে গ্রামোফনের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়া সুরু হবে—আর তাই থেকে ছেলেরা নোট নেবে।

এইখানেই চিঠি শেষ কর্‌তে হল। এই বার পৃষ্ঠা চিঠি পড়ে দেখ্‌তে পাবেন যে আপনি যে-কথাটী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন অর্থাৎ আপনার ছেলের ভবিষ্যত শিক্ষার সম্বন্ধে পরামর্শ সেই কথারই উত্তর দেওয়া হয় নি। কেননা সেরকম পরামর্শ দেবার আমি উপযুক্ত এ কথা মনে কর্‌তেই আমার মন সঙ্কুচিত হয়ে আসে। ইতি—

আপনাদের কয়েকদিনের—
অতিথি।

নৃত্য-শিক্ষক

—:*:—

(Maupassantর ফরাসী হইতে।)

বুড়ো জিন ব্রিডেল, যাকে আমরা সংসার-বিরাগী বলে ঠাট্টা করতেম, বলে উঠল দেখ, সংসারের বড় বড় দুঃখগুলো আমার তেমন লাগে না। আগেকার কালে আমি ডুয়েল লড়েছি নির্ম্মম হ'য়ে আমার প্রতিদ্বন্দীর বুকে চড়েছি প্রকৃতির রুদ্রসংহার লীলা দেখেছি, মানুষের উৎকট জিঘাংসা প্রবৃত্তির পরিণামও দেখেছি। ঐগুলো চোখে পড়লে আমরা ভয়ে বা রাগে চীৎকার করে উঠি, এই পর্য্যন্ত। ওসব দৃশ্য আমাদের বুকে যেয়ে কামড়ে ধরে না, ঝড়ের বেগে ভেতর বা'র কাঁপিয়ে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যায় না, যেমন কতকগুলো ছোট খাটো সাধারণ করুণ দৃশ্য করে থাকে। সংসারের সব চেয়ে কঠোর আঘাত লাগে যখন মা ছেলে-হারা হন, ছেলে মা হারা-হয়। মানুষের হৃদয়কে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়—এত কঠিন, দুর্জ্জয় এ শোক। কিন্তু মানুষ এমনতর শোকও কাটিয়ে উঠে, যেমন করে দেহের অতি বড়, সাংঘাতিক, সদ্য আঘাত সারতে দেখা যায়। কিন্তু সংসারে এমন বহু ব্যাপার আছে যা চোখের সুমুখে স্পষ্ট হ'য়ে না উঠেও ভেতরে তাদের বাস্তবিকতা টের পাইয়ে দেয়, গোপন মর্ম্ম-ব্যথা, ভাগ্যের অলক্ষ্য আঘাত, আরও বহু এমনতর আছে যেগুলো

আমাদের অন্তর শায়িত, বিষাদময় চিন্তাসমুদ্র আলোড়িত করে তুলে, বহির্জগৎ ডিঙ্গিয়ে মনোজগতের শোক-মন্দিরের বদ্ধ, রহস্যময় দোর পলক মধ্যে একেবারে খুলে দিয়ে যায়,—কি সে বেদনা !—উপরে দেখবে যত নির্ব্বিকার তত সে ভেতরে শিকড় গেড়েছে, তার লক্ষণ যত অস্পষ্ট তত সে বিকৃত হয়ে উঠেছে, যত তাকে নেই বলে উড়িয়ে দেবে তত সে বিস্তার লাভ করেছে এমনি করে মনটাকে দুঃখে মুষড়ে দিয়ে, জীবনকে বিস্বাদ করে দিয়ে, পৃথিবীর উজ্জ্বল বর্ণকে মলিন করে দিয়ে যে তারই জের বহুকাল ধরে তোমাকে টান্‌তে হবে।

আমার চোখের সুমুখে দুই তিনটী এমনি ব্যাপার ফুটে উঠেছে, বাঁকিগুলো অবশ্য ভাল করে না দেখাতেই ভুলে গেছি। ঐ কয়টি যেন লম্বা, সরু, তেলা-যায়-না-এমনি কাঁটার মত হয়ে আমার মনে বিধেঁ রয়েছে।

ওগুলো আমার মন যে ভাবে ভরে দিয়েছে হয়তো তোমরা তা বুঝতে পারছ না। একটার কথা তোমদের বলতে চাই। ঘটনাটা খুব পুরানো, কিন্তু এত স্পষ্ট, যে মনে হয় কালকের। হতে পারে আমার মনের টানেই কল্পনার সেটাকে এত তাজা রেখেছে।

আমার বয়স এখন পঞ্চাশ বছর। তখন আমি তরুণ যুবক, আইন পড়ছি। আমার প্রকৃতি ছিল কিছু গম্ভীর ও চিন্তাশীল; এবং দর্শন শাস্ত্র থেকে দুঃখ-বাদটাকেই আমি নিজের জন্য বেছে নিয়ে ছিলেম। এজন্য, কাফের হট্টগোল, কোলাহল প্রমুখ বন্ধু বান্ধব বা নির্ব্বুদ্ধি রূপের ব্যবসায়ী যুবতী নারীর প্রাচুর্য্য কোনটাই আমাকে টানতে পারে নি। খুব সকালই আমি বিছানা ছেড়ে উঠতেম; আর

আমার অতি আকর্ষণের বস্তু ছিল ভোর আটটায় লাক্সেমবার্গের উদ্যানে একা একা বেড়ানো।

তোমরা কেউ কখন লাক্সেমবার্গের সেই নার্শারী দেখেছ? সেটা ছিল যেন অতীত যুগের একটা ভুলে যাওয়া উদ্যান, বৃদ্ধার মুখে মধুর হাসি যেমন শোভার হয়, তেমনি ছিল তার শোভা। সরল অপরিসর, নিস্তব্ধ বেড়াবার ছোট ছোট পথগুলি দুই ধারে ঝাঁপড়া হেজরো দিয়ে বেড়া দেওয়া; মালির লম্বা কাঁচি সমান রেখায় তাদের ডালগুলো ছেঁটে দিয়ে শোভা বাড়িয়ে দিয়েছে। জায়গায় জায়গায় পুষ্পবাটিকা, লাণ্ঠন-বাঁধা ছোট ছোট গাছ, সার বেঁধে ছেলেরা যেমন করে বেড়ায় তারই অনুকরণে রোপিত, বড় বড় গোলাপের ঝাড় আর ফলবান বৃক্ষের শ্রেণী।

সুন্দর এই উদ্যানের এক পাশে মৌমাছির বাস। কাঠের তক্তার উপর খড় বিছিয়ে কৌশলে তৈয়েরি তাদের বাড়ী, দরজাগুলো সূর্য্যের আলোতে শেলাইয়ের সূচের ফুটোর মত চিক চিক করছে। লম্বা রাস্তার সবটা নিয়ে কেবল চক চকে মাছি গুণ গুণ করছে—দেখে মনে হয় ওরাই যেন এই নিঃশব্দ স্থানটির মালেক আর এর শব্দহীন শান্তিপূর্ণ বেড়াবার পথগুলিতে কেবল মাত্র ওদেরই বেড়াবার অধিকার আছে।

প্রায় রোজ সকালেই আমি সেখানে যেতাম। একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়ে পড়া সুরু করতেম। মাঝে মাঝে বইখানা কোলের উপর ফেলে রেখে স্বপ্ন দেখতেম, চুপ করে বসে আমার চার দিকে পারীর প্রাণ-স্পন্দন কান পেতে শুনতেম, এবং পুরানো এই উদ্যানের ছায়ায় বসে তার অগাধ অনাবিল শান্তি দেহ মন দিয়ে ভোগ করে নিতেম।

কিন্তু শীগ্‌গীরই আমার নজরে পড়ল যে অত সকালেও বাগানে আমি এক মাত্র ভ্রমণকারী ছিলেম না। প্রায়ই ঝোপের আড়ালে বেঁটে, অদ্ভুত দর্শন এক বুড়োর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হত।

রূপোর বকলস্‌ওয়ালা জুতো তার পায়ে, পরণে 'ক্যুলাত্' গায়ে স্প্যানিস্ রাইডিং কোট, মাথায় কিম্ভূতকিমাকার শাদা এক টুপী, যেমন-প্রকাণ্ড তেমনি খস্‌খসে; জন্ম তার মান্ধাতার আমলে।

দেখতে সে খিটখিটে, হাড়গোড় সার,—বঙ্কিম, আর মুখখানি নানা ভঙ্গিতে এবং হাস্যচেষ্টায় সদাই বিকৃত। চোখ দুটি চঞ্চল চোখের পাতা কেবল অস্থির ভাবে নড়ছে। রোজই তার হাতে থাকত সোনাবাঁধান একখানা চমৎকার ছড়ি, হয়ত কোন বড় লোকের স্মৃতি-উপহার হবে।

অদ্ভুত এই মানুষটিকে দেখে প্রথমে আমার মনে যে ভাবের উদয় হল সেটি হচ্ছে বিস্ময়; তার পরেরটি অসীম কৌতূহল।

গাছের ডাল পাতার আড়াল থেকে তার উপর নজর রাখতেম; হঠাৎ ধরা না পড়ে যাই এজন্য প্রতি মোড়ে থেমে থেমে একটু ফাঁকে থেকে তাকে অনুসরণ করতেম।

ব্যাপার যখন এইরূপ তখন একদিন সকালে আপনাকে একা ভেবে সে খামকা নানা ভঙ্গীতে হাত পা নাড়া সুরু করে দিল। প্রথমে কয়েকটি লাফ মেরে, মাথা নুইয়ে কাকে যেন অভিবাদন করা হল; তারপর তার সেই সরু সরু ঠ্যাং দুলিয়ে আরও লম্বা লম্বা ধাপে লাফ দিতে লাগল; তারপর দ্রুত লাফ, লম্ফ ঝম্ফ, দুলুনী—সে কি চমৎকার ভঙ্গিতেই যে সুরু হল! কোন অদৃশ্য দর্শক মণ্ডলীর সুমুখে যেন এই কাণ্ড হচ্ছে—তাঁদের দিকে চেয়েই যেন

সে হাসছে, মাথা নুইছে, হাত ছুঁড়ছে, পুতুলের মত তার শুটকো দেহ এঁকে বেঁকে ঘুরছে আর অতি মিঠে চালে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে! এই হল তার নাচ!

দেখে শুনে অতি বিস্ময়ে আমি কিছুক্ষণ 'থ' মেরে গেলাম; ভাবতে লাগলেম আমাদের দুইজনের মধ্যে কে উন্মাদ, সে না আমি। কিন্তু হঠাৎ থেমে যেয়ে আস্তে আস্তে সে এগোতে লাগল, যেমন করে রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনেতারা করে থাকে; তারপর মাথা নুইয়ে, কমেডিয়েনদের ষ্টাইলে অতি মধুর হাস্য করে, ঠোঁট দুখানা চুমো খাবার ভঙ্গিকরে এগোতে এগোতে দুসার গাছের দিকে তার কম্পিত হাত দুখানা বাড়িয়ে দিল!

এই ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে সে ফের গম্ভীর ভাবে বেড়াতে আরম্ভ করল।

সে দিন বেড়িয়ে যাবার সময়টীতে আমি তার উপর নজর রাখলেম। রোজ সকালেই সে একবার করে তার এই অপূর্ব্ব নাচ নেচে নিত।

কেন জানিনে তার সাথে আলাপ করতে আমার ভারি ইচ্ছা হল। সাহসে ভর করে, তাকে অভিবাদন করে বলে ফেললেম, 'আজকের দিনটি কি সুন্দর ম্যসোঁ!' সে নমস্কার করল,—'হাঁ ম্যসোঁ ঠিক আগেকার মতই'!

ঠিক আধঘণ্টা পরে আমি তার বন্ধু হয়ে দাঁড়ালেম, তার ইতিবৃত্ত সবই জানলেম। সে ছিল পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে অপেরার নৃত্য শিক্ষক। তার ছড়ি খানা কাউণ্ট ফ্লেরমণ্টির উপহার। নৃত্য সম্বন্ধে তার সাথে কথা কইতে আরম্ভ কইলে সে আর থামতে জানতো না।

একদিন আমাকে সে বললে,—'ম্যসোঁ, আমি লা কাসট্রিসকে যে করেছি আপনার ইচ্ছে হলে তার সাথে আলাপ করিয়ে দেব। সে এদিকে প্রায়ই আসে। এই যে উদ্যান আপনি দেখছেন এ আমাদের জীবন-স্বরূপ, সংসারের শেষ বন্ধন! আমাদের আমলের এইটি কেবল অবশিষ্ট আছে। মনে হয় এটি না থাকলে আমাদের বাঁচাই মুস্কিল হত। এটি প্রাচীন ও প্রাচীন স্মৃতিতে গৌরবময়—কেমন নয় কি? ওর ভেতরের বাতাসে যখন নিশ্বাস ফেলি, মনে হয় আমি যখন যুবা ছিলেম তখন সে বাতাস যেমন ছিল আজও তেমনি আছে—কিছু বদলে নি। আমরা দুইজন, আমার স্ত্রী ও আমি বৈকেল বেলাটা প্রায় এখানেই কাটাই। সকালে আমি একাই আসি কারণ এখনও আমি খুব ভোরে উঠে থাকি।'

সকালের আহার শেষ করেই আমি লাক্সেমবার্গ মুখে চলে এলেম, একটু পরেই দেখি আমার বন্ধু সসম্মানে এক কৃষ্ণপরিচ্ছদাবৃত অতি বৃদ্ধার হাত ধরে আসছেন। তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনিই ইচ্ছেন সেই বিখ্যাত নর্ত্তকী লাকাসট্রিস যার প্রেমে রাজা এবং সমস্ত অভিজাত বংশের যুবকেরা হাবুডুবু খেতেন, এবং প্রেমিক সেই যুগ যে যুগে পৃথিবীতে প্রেমের স্মৃতি ছড়িয়ে গেছে, সেই যুগের প্রতি যুবক জীবনে একবার করে এই কাষ্ট্রিসকে ভালবেসে ধন্য হয়েছিলেন।

আমরা সবাই পাথরের একটা বেঞ্চির উপর বসলেম। তখন মে মাস! ফুলের সুবাস উদ্যানের প্রতিকোণ গন্ধময় করেছে। সূর্য্যের মোলায়েম কিরণ পাতার ফাঁক দিয়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ছে। লাকাষ্ট্রিসের কাল পোষাক আলোয় যেন সেঁতিয়ে উঠেছে।

উদ্যান তখন জনমানব শূন্য। দূরথেকে ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ কানে আসছে।

বুড়ো সেই নৃত্য শিক্ষককে আমি জিজ্ঞাসা করলেম, "ম্যঁসো 'মেনুয়েট' কাকে বলে, আমায় বুঝিয়ে দেবেন কি?"

সে কেঁপে উঠল। 'ম্যঁসো, মেনুয়েট হচ্ছে নাচের রাণী, মেনুয়েট রাণীদের নাচ বুঝলেন? যেকালে রাজা গিয়েছে, সেকালে মেনুয়েট-ও গিয়েছে?' তারপর সে প্রচুর পরিমানে বিশেষণ লাগিয়ে মেনুয়েটের এক স্তোত্র আওড়াল যার মাথা মুণ্ড কিছুই আমার বোধ্য হল না। আমি তাকে তাল, ধাপ, ভঙ্গী সব বুঝাতে বললেম। নিজের অক্ষমতা দেখে সে আরও চঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠল। হঠাৎ তার নির্বাক গম্ভীর, অতি প্রাচীন সঙ্গীনীটির দিকে ফিরে বলে উঠল,—এলিব, এই ভদ্রলোকটি—উনি যা বলছেন—ইচ্ছে হলে—তোমার বেশ হবে—আমাদের একবারটি দেখিয়ে দেবে?

সে চঞ্চল দৃষ্টিতে চার দিক একবার চেয়ে দেখল। তারপর বিনাবাক্যে উঠে তার সুমুখে দাঁড়াল।

এরপর এক অপূর্ব্ব ব্যাপার আরম্ভ হল যা জীবনে কখন ভুলব না।

তারা দুইজনেই নাচা সুরু করলে,—অতি ছেলেমানষী মুখের ভঙ্গী করে, হেসে, ঘাড় কাৎ করে, লাফিয়ে ঠিক যেন দুটো পুরানো পুতুল, পাকা খেলোওয়ারের হাতে নাচছে; ব্যবহারে যেন কিছু নষ্ট হয়েছে, কিন্তু তৈয়েরী পুরানো ফাস'নে, অতি পাকা মিস্ত্রীর হাতের।

আমি হাঁ করে তাদের দিকে চেয়ে রইলেম, মনে উদয় হতে লাগল যত অদ্ভুত, এলোমেলো ভাব। সব মনটী কেমন অব্যক্ত বিষাদে ভরে গেল।

মনে হল চোখের সুমুখে এক শোকার্ত্ত হাস্যকর ভূত দেখছি—অতীত যুগের কোন বিস্মৃত প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মনে হল হাসি, রুদ্ধ কণ্ঠ ঠেলে আসতে চাইল কান্না।

তারপর তারা দুইজন থেমে গেল, নৃত্যের সমস্ত অঙ্গ শেষ করে দিয়ে। কিছুক্ষণ ধরে মুখোমুখি চেয়ে অতি অদ্ভুত ধরণে হাসতে লাগল। শেষে কান্নার চাপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আলিঙ্গন বন্ধ হল।

তিন দিন পরে আমি আপনার জেলায় চলে এলাম। তাদের সাথে আর দেখা হয় নি।

দুই বছর পরে ফের যখন পারীতে এলেম তখন তারা উদ্যানটি ভেঙ্গে ফেলেছে। হায়,—কোথায় গেল সেই প্রিয় বাগানটি, তার আঁকা বাঁকা পথগুলি, তার অতীত যুগের হাওয়া, তার সুন্দর আড়াল করা ঝোপ আর ঝাড়!

আমার বন্ধুরাও কি আর নেই? না এই সব আধুনিক পথ বেয়েই হতাশ নির্ব্বাসিতের মত তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে? এখন কি তারা আলেয়ার মত গোরস্থানের সাইপ্রেস গাছের আড়ালে, যে পথের দুইধারে দেহান্ত মানুষকে চিরদিনের মত শুইয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সব পথের উপর চাঁদের আলোতে তাদের অদ্ভুত 'মেনুয়েট' নৃত্য দেখিয়ে বেড়ায়?

তাদের চিন্তা সব সময়েই আমার মনে হয়,—আর সকল চিন্তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, খুঁচিয়ে, সব মনটা দখল করে আজও ব্যথার মত তা জেগে আছে।

কেন?—আমি তা বলতে পারি না।

নিঃসন্দেহে ব্যাপারটা তোমাদের কাছে খুব হাস্যকর মনে হচ্ছে—নয় কি?